ভারতের সংস্কৃতি

ক্ষিতিমোহন সেন

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই, ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর, যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এ যাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১২৯ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

ভারতের সংস্কৃতি

ক্ষিতিমোহন সেন

বি শ্ব ভা র তী

কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ৩

প্রকাশ ১ আষাঢ় ১৩৫০

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫০

পুনর্মুদ্রণ ১৩৫২, ১৩৬১

কার্তিক ১৩৬৯ : ১৮৮৪ শক

মূল্য ১·০০ টাকা

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু
শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

১·১

সূচী

ভূমিকা

সব মানুষই এক ভগবানের সন্তান, অথচ সব দেশেই মানুষের মধ্যে নানাভাবে নানা রকমের ভেদ-বিভেদ রয়েছে। কিন্তু মানুষের সব-চেয়ে সাংঘাতিক রকমের সামাজিক ভেদ ভারতবর্ষে। আবার সব-চেয়ে সকল মানবের মধ্যে সাম্য ও অভেদের বাণী উচ্চারিত হয়েছেও এই ভারতেই। ভারতের মহাপুরুষেরা সকলেই মানবের মধ্যে নানা ভেদ-বিভেদের অবসান করবার মহামন্ত্রই ঘোষণা করে গিয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে ভারতে যা আছে এবং যা হওয়া উচিত— অর্থাৎ এখানকার ভূত ও ভব্যের মধ্যে একটা মস্ত অসংগতি বরাবরই চলে আসছে।

ভারতের নানা ভেদ-বিভেদের মধ্যে যোগস্থাপনার জন্য যুগে যুগে ভগবান একে একে তাঁর আপন যোগ্যতম সব সাধককে পাঠিয়েছেন। সেই যোগ আজও সম্পূর্ণ হয় নি। যতদিন এই যোগস্থাপন-চেষ্টার প্রয়োজন থাকবে ততদিন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধকদের ক্রমাগতই এ দেশে পাঠাবেন।

মহাবীর, বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ, বসব, রামানন্দ, রবিদাস, কবীর, নানক, চৈতন্য, দাদূ প্রভৃতি প্রাচীন যুগের সব যোগসাধক মহাপুরুষের দল এই কাজই করে গিয়েছেন, এই যুগেও মহাপুরুষের পর মহাপুরুষ এই কাজই করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। যুগগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাতে এইটেই হল মর্মকথা।

ভারতে ভগবান বৈচিত্র্যকেই চেয়েছেন বলে এখানে কোনো প্রবল সভ্যতা বা সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল অন্য সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে বিনাশ করে নি। সবাই পাশাপাশি বন্ধুভাবে বাস করেছে। বিভিন্নতা থাকলেই বা বিদ্বেষবুদ্ধি কেন জাগবে। এখানে ভগবান হয়তো চান সকল সাধনার মধ্যে মৈত্রী এবং সকল সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের সাধনা। জগতে আর কোথাও ঠিক এমনতরোটি দেখা যায় না। সেখানে এক ধর্ম বা সংস্কৃতি অন্য সব দুর্বল ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মেরে ফেলে সমস্যা সোজা করে দিয়েছে। সে সহজ পথ ভারতের নয়।

ভারতের শাস্ত্রে যা সারতম কথা তাই দিয়েই ভারতীয় সাধনার পরিচয়। সব ধর্মেই তাই হয়। প্রদীপের পরিচয় তার শিখায়, মানুষের পরিচয় তার প্রাণে। হীরার খনির মধ্যে হীরা অল্প, মাটিই বেশি। কবীর বলেছেন

"হীরোকী ওবরী নহী", খনিতে হীরা স্তূপাকৃতি হয়ে নেই। তবু হীরার নামেই তার পরিচয়।

ইহলোক নিয়ে সাধনা হল সংস্কৃতি, অনন্তলোক নিয়ে সাধনা হল ধর্ম। ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্ম দুয়ের মধ্যেই অনেক যুগের অনেক মানব-মণ্ডলীর নানা দান মিলে মিশে আছে। সংস্কৃতি হতেও ধর্মেই প্রবর্তকদের পরিচয় সহজে পাওয়া যায়, তাতেও দেখা যায় ভারতের হিন্দুধর্ম কোনো বিশেষ যুগে কোনো বিশেষ মহাপুরুষের দ্বারা প্রবর্তিত হয় নি। সেইজন্য হিন্দুধর্মকে এক হিসাবে অপৌরুষেয় ধর্ম বলা যেতে পারে। ভারতে যত সংস্কৃতি বা ধর্ম এসেছে সবার সব দান একত্র মিলিত হয়েছে যে ধর্মে, তাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তিত ধর্ম না বলে তার জন্মভূমির ভৌগোলিক নামে তাকে 'ভারতীয় ধর্ম' বলাই সংগত। ভারতকে হিন্দ বলে। তাই এই দেশের সর্ব সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিধাতার নির্দেশে যে ধর্মটি যুগের পর যুগের সাধনায় গড়ে উঠেছে তাকে হিন্দের অর্থাৎ ভারতের, হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম বলাই ঠিক। ধর্মসাধনায় এই সমন্বয়কেই মহাত্মা কবীর ভারতের তপস্যা বলছেন। তাই তাঁর পন্থকে 'ভারতপন্থ' বলা হয়েছে। কবীরের শিষ্য যুগলানন্দ তাঁর সব গ্রন্থসম্পাদনের সময় নিজেকে 'ভারতপথিক' যুগলানন্দ বলেই পরিচয় দিয়েছেন।

মহাত্মা কবীরের সেই 'ভারতপন্থ' আজও সম্পূর্ণ সাধিত হয় নি। রামমোহন রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সবাই এই ভারতপন্থেরই সেবায় জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের সাধনার ও সংস্কৃতির সেই গতিটি অল্পের মধ্যে সহজ কথায় দেখাবার চেষ্টা করা গিয়েছে। বর্তমান যুগেই নয়, মধ্যযুগেই নয়, ভারতের আদিকাল হতেই ভগবানের নির্দেশে এই সাধনা নিঃশব্দে নিরন্তর চলেছে।

ভারতে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য

কুমীরের বাস জলে, তাই জলেই তার শক্তি-সামর্থ্য। বাঘের বসতি জঙ্গলে, সেখানেই তার প্রতাপ। দেখা যাচ্ছে জীবের পরিচয় মেলে তার ভৌগোলিক বাসস্থানে। কিন্তু মানুষের মধ্যে জীব এবং শিব দুয়েরই সম্মিলন রয়েছে বলে মানুষের সবটা পরিচয় তার ভূগোলে মেলে না।

ঋষি বললেন, জীবদের ভূমিতেই ছেড়ে দেওয়া হল— 'জীবান্ বিসসর্জ ভূম্যাম্'[১]। কিন্তু মানুষকে ভূমিতেই ছেড়ে দেওয়া চলে নি। মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্ভব হল তার সংস্কৃতিতে। কাজেই মৃন্ময় লোক ছাড়িয়ে চিন্ময় জগতেই মানুষের পূর্ণ পরিচয়। স্থানগত পরিচয় তার আসল কথা নয়। গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাহৃতিতে প্রথমে স্থানবাচক 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' বলেই তার পরেই মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলতে হল পরমদেবতার সঙ্গে ধীশক্তিগত যোগের চিন্ময় কথা :

ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।[২]

কারণ সেই চিন্ময় জগতেই যথার্থ মানবত্বের উদ্ভব ও সংস্থিতি, শুধু ভূগোলের জগতে নয়। এইজন্যই দেখতে পাওয়া যায় একই ভৌগোলিক পৃথিবীতে বাস করেও সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অন্তহীন বৈচিত্র্যেই মানুষের বৈচিত্র্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে দেখি, যেখানে সে গিয়েছে সেখানে স্থানীয় পুরাতন সভ্যতাকে ধ্বংস ও নির্মূল না করে সে তৃপ্ত হয় নি। এই ধ্বংসের ব্যাপার যে শুধু সংস্কৃতিতে অনগ্রসর অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিলণ্ডে ঘটেছে, তা নয় ; আমেরিকার সুসভ্য 'মায়া' ও 'আজতেগ' সভ্যতারও উচ্ছেদ না করে সে নিবৃত্ত হয় নি। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস অন্য রকমের। এখানে হয়তো সেরকম করে অন্যদের উচ্ছেদ করা সম্ভবও হয় নি, আর ভারতের ইতিহাস-বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায়ও হয়তো অন্যরূপ।

ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় আর্যদের আসবার পূর্বে আর্যপূর্ব দ্রাবিড় সভ্যতাকে আর্যেরা নষ্ট করেন নি। দ্রাবিড়েরাও তৎপূর্ব সব সভ্যতার

---

১ মহানারায়ণ উপনিষৎ ১, ৪

২ ঋগ্বেদ ৩, ৬২, ১০

উচ্ছেদসাধন করেন নি। এই ভাবে বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পলিমাটি দিয়ে স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে ভারতের সংস্কৃতিলোকটি গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি সবাই বসবাস করেছে। কেউ কাউকেও নির্মূল করে নি। বিধাতা বোধ হয় ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটি যোগসাধনা চেয়েছেন। তাই যখন শান্তিনিকেতনে বসে কবিসাধক রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-সাধনা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করছেন তখন তার পাশেই সাঁওতালেরা তাদের পাড়ায় 'বোঙ্গা'পূজায় মত্ত আছে। পাশ্চাত্য জগতে এমনটি কোথাও দেখতে পাওয়া অসম্ভব।

অতি উন্নত ও অতি অনুন্নত সাধনা এখানে পাশাপাশি রয়েছে বলে ধর্ম ও সাধনার তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে ভারতের মতো এমন উত্তম বিচারক্ষেত্র আর নেই। এখানে অগ্রসর অনগ্রসর সংস্কৃতির চরম দৃষ্টান্ত একই স্থানে মিলবে। পাশাপাশি নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ জীবন্ত থাকাতে এ দেশে কত রকম সাধনারই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে এবং সেইজন্যেই এই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পদ নানা বিচিত্র ঐশ্বর্যে ভরপুর।

জ্ঞানালোচনার পক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে যতই সুবিধা হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় সংহতি ও শক্তির পক্ষে এইরূপ অবস্থা সাংঘাতিক। নৌকাকে খণ্ড খণ্ড করে রাখলে নৌবিদ্যা শেখাবার পক্ষে হয়তো সুবিধা হতে পারে কিন্তু সেই-রকম নৌকায় সাগর পার হতে গেলেই বিপদ। শক্তির মূল কথা সংহতি। পশুরাও সেই কথা মানে, তাই অনেক পশু দলবদ্ধ হয়েই শক্তিলাভ করে। মানুষের প্রধান সম্পদ তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতিগত ঐশ্বর্যের জন্য চাই ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্র্য। পশুরা সংহতির উপরে উঠতে পারে নি, ব্যক্তিত্বটা হল মানুষের সংস্কৃতির গূঢ় কথা।

রাষ্ট্রীয় জীবনে কিন্তু সংহতিই বড়ো কথা, ব্যক্তিত্ব সেখানে অনেক সময় বৃথা বাধা মাত্র। অথচ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। রাষ্ট্রীয় শক্তির মূলে তাই কতক পরিমাণে পশুধর্ম রয়ে গিয়েছে।

আমাদের দেশে নানা জাতি নানা শ্রেণী নানা ভেদ-বিভেদ রয়েছে। এগুলি সংস্কৃতির সহায়ক হলেও রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে মহাসমস্যা হয়েছে। দেশে বিদেশে য়ুরোপীয়রা পূর্ববর্তী সকলকে উচ্ছেদ করেই সেই সমস্যার চমৎকার সমাধান করেছেন। আর বিচিত্রতাযুক্ত আমাদের দেশ এই সমস্যার জন্যই আজ

নানাভাবে বিড়ম্বিত এবং নিগৃহীত। অথচ এর মূলে ছিল অন্য সকলকে লুপ্ত করে না ফেলবার শুভ ও উদার মনোবৃত্তি।

নানা শ্রেণীর সংস্কৃতি পাশাপাশি থাকলেই উন্নতির মাপকাঠিতে উচ্চনীচ ভেদ এসে পড়ে। তাই ভারতেও যুগে যুগে সেই ভেদ এসে পড়েছে। ভারতের ইতিহাসে যে-সব মহাপুরুষ সেই ভেদ-বিভেদের বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের মধ্যে প্রীতির ও মহত্ত্বের যোগ-সেতু রচনা করতে পেরেছেন তাঁরাই আমাদের মহাপুরুষ। রাম, কৃষ্ণ, মহাবীর, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা এই কাজই করে গেছেন। গুহকমিত্র রামকে, আভীরবন্ধু কৃষ্ণকে ভারতবর্ষ নিত্য স্মরণ করে, কিন্তু বড়ো বড়ো রণজয়ীর কথা তার স্মরণে নেই। রবীন্দ্রনাথ ভারতের ইতিহাসের ধারায় এই সত্যটি চমৎকার করে দেখিয়েছেন। অন্তহীন ভেদের মধ্যেও একটি অখণ্ড মহান সমন্বয়ের মহাতপস্যা ভারতের জন্য বিধাতা চিরদিন ভিতরে ভিতরে নির্দেশ করে আসছেন।

আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন

মোহেঞ্জোদরো হরপ্পা প্রভৃতিতে যে সভ্যতার পরিচয় মেলে সে সভ্যতা খুবই উঁচুদরের। কাজেই অতিপ্রাচীন যুগেও ভারতের সভ্যতা যে কত উন্নত ছিল তা বেশ বোঝা যায়। বৈদিক আর্যেরা যে তাঁদের পরাজিত করলেন তার কারণ বেদপূর্ব ভারতে লোহা ও ঘোড়া ছিল না। মোহেঞ্জোদরোতে আর-সব পেলেও লোহা ও ঘোড়া পাওয়া যায় নি। বৈদিকেরা লোহা ও ঘোড়া ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন। তা ছাড়া সংহত একদল আক্রমণকারীর কাছে, যতই সভ্য হোক গৃহস্থের দল পেরে ওঠে না। তাই মোগলেরা ও তুর্কিরা এত সহজে বড়ো বড়ো সব সভ্যতাকে জয় করতে পেরেছেন।

বৈদিক সভ্যতা ভারতে এসে যাগযজ্ঞময় কর্মকাণ্ড নিয়ে তার যে সংস্কৃতিটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার মূল স্থান হল যজ্ঞবেদী। যজ্ঞবেদীরই চার দিকে বৈদিক সংস্কৃতির শিক্ষায়তনটি ক্রমে গড়ে উঠল। আর বেদবাহ্য যে অপূর্ব সভ্যতা ভারতে ছিল, তীর্থগুলিকে আশ্রয় করে অগ্রসর হওয়ায় 'তৈর্থিক' বলে তা

পরিচিত হল। এই 'তৈর্থিক' সভ্যতার মধ্যে অনেক উন্নত ও মহৎ ভাব ছিল, বৈদিক সভ্যতা ক্রমে সেগুলির দ্বারা ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠতে লাগল।

বেদের প্রথম দিকে আমরা ইহলোকের কাম্য ধনজন ও পরলোকের কাম্য স্বর্গের কথাই পাই। ধর্মের জন্য যজ্ঞ, যজ্ঞের জন্য জীবহিংসা না করলে চলে না। ক্রমে দেখা গেল বৈদিক আর্যেরা নিষ্কাম ধর্ম অহিংসা প্রভৃতি সব মহা উচ্চ ভাবে ভরপুর হয়ে উঠলেন। নিরামিষ-আহার ভক্তি জন্মান্তরবাদ মায়াবাদ যোগসাধনা বৈরাগ্যসাধনা ভক্তিসাধনা ব্রত উপবাস তীর্থস্থান প্রভৃতি বড়ো বড়ো সব আদর্শ ক্রমে আসতে লাগল। ভক্তি ও প্রেমের কথা বেদে থাকলেও অনেকে মনে করেন, দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবেই তা ভারতীয় সাধনায় প্রধান স্থান পেয়েছে। এখানকার সবকিছুরই মূলে আর্য ও আর্যপূর্ব সভ্যতার গভীর সংযোগ। প্রধানত এই দুই সভ্যতার সংগমতীর্থেই পরবর্তী কালের পরম ঐশ্বর্যময় হিন্দুধর্ম জন্মলাভ করেছে। যেখানে আর্যপূর্ব উন্নত মতবাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে সেখানে এই মিলনের ফল খুব সুন্দর হয়েছে, যেমন সকাম স্বর্গের জায়গায় এল ক্রমে নিষ্কাম মুক্তির সাধনা ও কর্মকাণ্ডের স্থানে এল 'ভক্তিবাদ'। আবার কোথাও কোথাও প্রাকৃত সব মতবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এল তন্ত্র-মন্ত্র-অভিচার প্রভৃতির শাস্ত্র। মিশবার ফলে ভালো মন্দ দুইই আসতে বাধ্য। অথর্ববেদে প্রাকৃত সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতির একটা সেইরকম গভীর যোগের পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়। তার ফলে দেবতার বদলে মানুষের প্রতি ও স্বর্গের বদলে পৃথিবীর প্রতি যে অনুরাগের নমুনা অথর্ববেদে দেখা যায় বৈদিক সাহিত্যেও তা অপূর্ব। অনেক স্থূল ও কুৎসিত বস্তুও ক্রমে উন্নত ও পবিত্র হয়ে উঠেছে এই সংযোগের ফলে।

আর্যেরা নদ নদী বিল সমুদ্রের সঙ্গে বেশি পরিচিত ছিলেন না। তাঁরা এসে যখন নাগ প্রভৃতি অনার্য অথচ সুসভ্য জাতিকে তাড়া দিলেন তখন নাগবংশীয়েরা জলাশয়ের কাছে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। মহাভারত প্রভৃতি দেখলে তা বেশ বুঝা যায়। এই নাগকন্যার গর্ভজ জরৎকারু মুনির পুত্র আস্তিক। তিনি ব্রাহ্মণোত্তম ছিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা অনার্য বিবাহ করতেন, সন্তানেরা ব্রাহ্মণই হতেন। মহাভারত পুরাণাদি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। আগে এই-সব বিবাহের সন্তান পিতার জাতিই পেতেন। কারণ আর্যদের মধ্যে

প্রধান হল পুরুষ। তাকে বলে বীজপ্রাধান্য। পরে দ্রাবিড়াদি জাতির মাতৃতন্ত্র সমাজের প্রভাবে মায়ের জাতই সন্তানেরা পেতে লাগলেন। তার নাম ক্ষেত্রপ্রাধান্য। তা অনার্য প্রভাবের ফল।

ভীম যখন কৌরবদের বিষে হতচেতন হয়ে জলে ভাসতে ভাসতে নাগদের দেশে গেলেন, সেখানে ভীমকে আত্মীয় বলেই নাগরাজ যত্ন করলেন। ভীমের সঙ্গে তাঁদের রক্তের যোগ ছিল। নাগেরা আর্য না হলেও খুবই সভ্য ছিলেন। জলের সঙ্গে সম্বন্ধ যে-সব জিনিসের আছে তার অনেকই এই অনার্যদের থেকে পাওয়া। জালও জলসম্বন্ধীয়। নৌকা ও নৌকার অনেক কিছু এই সূত্রে এসেছে। মাছ খাওয়াটাও প্রধানত অনার্যদের কাছে শেখা। আর্যেরা বেশির ভাগ মাংসই খেতেন। শাঁখা আর্যেরা জানতেন না, শাঁখা-সিঁদুর প্রভৃতি এয়োর চিহ্ন নাগদের কাছে পাওয়া।

নৃত্যগীতবাদ্যও আর্যরা অনার্যদের থেকেই পেয়েছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদগান ছাড়া শিব বা বিষ্ণুর জন্য নৃত্য-গীত করা নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্র ও নারীরাই তা করতে পারতেন। ভাগবতেরা ভক্তির গান সমাজে প্রবেশ করালেন। লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি দেখলে তা বোঝা যায়। তবু সমাজে গীতবাদ্য যাদের জীবিকা তাদের স্থান খুব নীচ ছিল। নাটকেও আর্যরা এ দেশে অনেক কিছু ঐশ্বর্য লাভ করেছেন।

সম্মিলনের অপূর্ব ফল

আর্য অনার্য সম্মেলনের ফল যে কী অপূর্ব হতে পারে তার অন্তত একটি দৃষ্টান্ত এখানে না দিয়ে পারি নে। যদিও এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু একটির বেশি এখানে বলা হবে না, কারণ বেশি বললে হয়তো পাঠকের ধৈর্য না থাকতে পারে। এক ঋষির ব্রাহ্মণী পত্নী ছিলেন, শূদ্রা পত্নীও ছিলেন। তখনকার দিনে যজ্ঞস্থলে বসেই শিক্ষা দেবার চমৎকার সুযোগ মিলত। যজ্ঞ উপস্থিত হল, মায়েরা শিক্ষালাভ করবার জন্য ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন যজ্ঞস্থলে তাদের বাপের কাছে। সেই মহর্ষি আপন ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভজাত ছেলেকে কোলে বসিয়ে আদর করে শিক্ষা দিলেন কিন্তু শূদ্রা পত্নীর সন্তানকে যজ্ঞস্থলে উপেক্ষা করলেন।

ছেলে এসে সেই দুঃখে মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'মা, বাবা আমাকে যেন চিনতেই পারলেন না।' মাও চোখের জল রাখতে পারলেন না। ছেলে তখন বললে, 'মা, আমার শিক্ষার তবে কী উপায় হবে।' মা বললেন, 'তোমার বাপই যখন তোমাকে উপেক্ষা করলেন তখন আর কার কাছে যাব। আচ্ছা, আমি তো শূদ্র-কন্যা অর্থাৎ পৃথিবীর সন্তান (child of the soil), আমার মা পৃথিবীকে ডেকে দেখি।' এই বলে তিনি পৃথিবীকে ডাকলেন।

মাতা বসুন্ধরা এসে বললেন, 'ভয় নেই, সব জ্ঞানই তো আমার মধ্যে নিহিত, এই ছেলেকে দাও আমার হাতে, আমি একে শিক্ষা দেব।' পৃথিবীমাতা ছেলেকে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তখন সেই ছেলে তাঁর বাল্যকালের অপমানের শোধ তুললেন। তিনি ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগ্রন্থ লিখলেন। আজ যিনি যত বড়ো বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণই হোন না কেন, সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থখানি না পড়লে ঋগ্বেদের মধ্যে প্রবেশ করাই অসম্ভব। তার পর তিনি নিজে যে শূদ্রার অর্থাৎ ইতরার ছেলে এইটে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি নিজেকে ইতরার পুত্র 'ঐতরেয়' নামে খ্যাত করলেন, তাই সেই ব্রাহ্মণের নাম হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এই শূদ্রা মায়ের ছেলের আসল নামটি ঐ ঐতরেয় নামের তলে চাপা পড়ে আছে। মহীর শিষ্য বলে তাঁকে মহীদাসও বলে। তাই ঐতরেয় মহীদাসই তাঁর পরিচয়। এই ঋষির সব কথা 'ঐতরেয়ালোচনম্' নামে গ্রন্থে স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় লিখেছেন।

ঋগ্বেদ জানতে হলেই যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রয়োজন শুধু এই কথা বললে খুব অল্প বলা হবে। বড়ো বড়ো চিরন্তন সত্য ঐ গ্রন্থে এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, এখনও তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, এগিয়ে চলাই এখনকার ধর্ম। আমরা মনে করি পুরোনো যুগে স্থিতিশীলতাই ছিল ধর্ম। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭, ১৫, ১-৫) একটি গল্পে রোহিতকে যে উপদেশ দেবতা দিচ্ছেন তার চেয়ে গতিশীল ধর্মের উপদেশ কোথাও শুনি নি। রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল চলে চলে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য যখন ঘরের দিকে চলেছেন তখন পথে তাঁকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র পর-পর পাঁচবার বললেন—

> নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
> পাপো নৃষদ্ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥ চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীর অন্ত নেই, হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা (comrade) হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠ জন হলেও ক্রমে নীচ (পাপ), হতে থাকে অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

> পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
> শেরহস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥ চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে চলে, দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তার আত্মা দিনে দিনে বিকশিত হতে থাকে, এই তো মস্ত ফল। তার পর তার চলার শ্রমে চলবার মুক্ত পথে তার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হয়ে পড়ে শুয়ে। পাপের সমস্যার জন্য আর তার বৃথা মাথা ঘামাতে হয় না। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

> আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
> শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ॥ চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে বসে থাকে তার ভাগ্যও থাকে বসে, যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও পড়ে শুয়ে, যে এগিয়ে চলে, তার ভাগ্যও চলে এগিয়ে। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

> কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
> উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্॥ চরৈবেতি, চরৈবেতি।

ঘুমিয়ে থাকাটাই হল কলিকাল, জাগলেই হল দ্বাপর, উঠে দাঁড়ালেই হল ত্রেতা, এগিয়ে চলাই হল সত্য যুগ। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

> চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
> সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যৌন তন্দ্রয়তে চরন্॥ চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, চেয়ে দেখো ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়ে নি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

এর চেয়ে এগিয়ে চলবার দীপ্ততর বাণী কি আর কোথাও শুনেছি। এখনকার দিনের উন্নততম দেশেও এই বাণীগুলিকে মূলমন্ত্র করে নিলে তাঁদের এগিয়ে চলবার সাধনার পক্ষে কোনো লজ্জার কারণ হয় না।

শিল্প সম্বন্ধেও ঐতরেয়ের বাণীগুলি অপূর্ব। ঐতরেয় বলেন, শিল্পীরা তাঁদের শিল্প-সৃষ্টির দ্বারাই দেবতার স্তব করছেন। সৃষ্টিতে যে দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই-সব শিল্প, তাই বুঝতে হবে। যিনি এই ভাবে শিল্পকে দেখেছেন তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা। শিল্পসাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলেন।

ওঁ শিল্পানি শংসতি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ শিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে…। শিল্পং হাস্মিন্নধিগম্যতে য এবং বেদ যদেব শিল্পানি। আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।—ঐ. ব্রা. ৬, ৫, ১

শিল্প সম্বন্ধেও এর চেয়ে বড়ো কথা আর শোনা যেতে পারে না। এই-সব মহা মহাবাণী উচ্চারণ করে গেছেন যে মহর্ষি সেই ঐতরেয় ছিলেন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির একটি অপরূপ ও মহনীয় সমন্বয়। ঐতরেয় বলেন, অনার্যেরা পৃথিবীর সন্তান। ইতরা তাই মাতা পৃথিবীকে শরণ করেছিলেন। আর্য-অনার্য মিলনে তাই যে-সব বিদ্যার সম্ভাবনা হল, তার সঙ্গে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ যোগ যে আছে, তা এই চৌষট্টি কলার তালিকা দেখলেই বোঝা যায়।

৬৪টি কলার নাম—(১) নৃত্য, (২) গীত, (৩) বাদ্য, (৪) উদক বাদ্য, (৫) নাট্য, (৬) সাজসজ্জা ও কুরূপকে সুরূপ করবার বিদ্যা বা কৌচুমার যোগ, (৭) নেপথ্য বা বেশ-রচনা, (৮) বিশেষকছেদ্য বা তিলকাদি রচনা (৯) দশন-বসন-রঞ্জন, (১০) কেশে পুষ্পবিন্যাস, (১১) কেশবিন্যাস, (১২) পুষ্পাস্তরণ, (১৩) মাল্যরচনার বিদ্যা, (১৪) গন্ধযুক্তি, সুগন্ধপ্রস্তুত বিদ্যা, (১৫) আলেখ্য, বর্ণকরণ ও চিত্রকরণ, (১৬) প্রতিকৃতি নির্মাণ, (১৭) যুদ্ধবিজয় বিদ্যা, (১৮) বৃক্ষায়ুর্বেদ, (১৯) নানাবিধ পাকবিদ্যা, (২০) পানীয় রচনা, (২১) তক্ষণ বা ছুতরের বিদ্যা, (২২) চরখা কাটা, (২৩) বেত ও তৃণাদির দ্বারা ডালা কুলো প্রভৃতি রচনা (২৪) শয্যা রচনা, (২৫) সূচীকর্ম, (২৬) খেলনা রচনা, (২৭) ভূষণ অর্থাৎ অলংকার রচনা, (২৮) কর্ণপত্র, কর্ণালংকার প্রস্তুতবিধি, (২৯) তণ্ডুল কুসুমাদি দ্বারা পূজোপহার রচনা, (৩০) সম্পাট্য অর্থাৎ হীরা-মণি-রত্নাদি কাটা, (৩১) মণিরত্ন বসানো, (৩২) বাস্তুবিদ্যা, (৩৩) মণিরত্নজ্ঞান, (৩৪) ধাতুরত্নাদি

বিচার, (৩৫) খনিবিদ্যা, (৩৬) ধাতুবিদ্যা (শুক্রনীতি মতে যন্ত্রশিল্প), (৩৭) ইন্দ্রজাল, (৩৮) বস্ত্র গোপন, (৩৯) হস্তলাঘব, (৪০) চিত্রযোগ, (৪১) সূত্রক্রিয়া, পুতুলনাচ, (৪২) পশু-পক্ষী লড়ানো, (৪৩) পাখি পড়ানো, (৪৪) দ্যূতবিদ্যা, (৪৫) আকর্ষণ ক্রীড়া, (৪৬) অভিধান বিদ্যা, (৪৭) বৈনয়িকী বিদ্যা, (৪৮) দেশভাষাজ্ঞান, (৪৯) ম্লেচ্ছিতক-বিকল্প, ম্লেচ্ছ ভাষার জ্ঞান, (৫০) কাব্য-সমস্যা পূরণ, (৫১) অক্ষরমুষ্টিকা, অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষর রচনা, (৫২) উত্তমরূপে পড়িবার বিদ্যা, (৫৩) নাটকাখ্যানাদি দর্শন, (৫৪) মানসী কাব্য-ক্রিয়া, (৫৫) প্রহেলিকা, (৫৬) যন্ত্রমাতৃকা, (৫৭) উদকঘাত, (৫৮) উৎসাদন, (৫৯) দুর্বাচক যোগ, (৬০) পুষ্পশকটিকা, নিমিত্তজ্ঞান, (৬১) ধারণমাতৃকা, (৬২) ক্রিয়াবিকল্প, (৬৩) ছলিতক যোগ, (৬৪) বৈতালিকী বিদ্যা।

শ্রাদ্ধোৎপত্তি

আমাদের এখনকার দিনের দিনকৃত্য পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেও অনেক পরবর্তী সব প্রভাব আছে। এ দেশে আর্যেরা চারি দিকের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। ধর্মে কর্মে জীবনযাত্রায় জীবনের সব অনুষ্ঠানে নানা ভাবে এই আর্য অনার্য দুই ধারার সমন্বয় দেখা যায়। তার মধ্যে বৈদিক ধারার চেয়ে অবৈদিক ধারাই যেন·বেশি জোরালো।

আমাদের ধর্মানুষ্ঠানে এখন প্রধানত হব্য এবং কব্য এই দুই ভাগ— হব্য হল দেবতাদের আরাধনা এবং কব্য হল পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি। হব্যটা খুব প্রাচীন বৈদিক প্রথানুগত, আর্যদের পক্ষে কব্যটুকু অনেকটা পরবর্তী কালের। আর্যেরা প্রাচীনকালে মৃতদেহ মাটিতে নিহিত করতেন। পরে এ দেশে কাষ্ঠবাহুল্য দেখে দাহপ্রথা গ্রহণ করলেন। সেই পুরাতন প্রথার একটু আধটু অবশেষ এখনও আছে। দেহান্তে অস্থি যে গঙ্গায় বা তীর্থে দিতে হয় তাও বৈদিক প্রথা নয়। সাঁওতালদের মধ্যে মৃতের অস্থি দামোদর নদে দেওয়া চাই। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গুরু এবং মাতামহ, মামা, ভাগ্নে, দৌহিত্র, জামাতা, মাসতুত পিসতুত ভাই প্রভৃতি কন্যাগত সম্বন্ধযুক্তদেরই আদর বেশি।[৩]

৩ কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ, ২১, ২০

কন্যাতন্ত্রতাও আর্যদের নয়। কূর্মপুরাণ বলেন মাতৃযাগ না করে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করলে মাতৃগণ হিংসা করেন।

অকৃত্বা মাতৃযাগন্তু যঃ শ্রাদ্ধন্তু নিবেশয়েৎ।
তস্য ক্রোধসমাবিষ্টা হিংসামিচ্ছন্তি মাতরঃ ॥—উপরি, ২২, ১০২

অশৌচ শূদ্রদের যে বেশি এবং ব্রাহ্মণদের যে কম তার মধ্যেও হয়তো এইটেই কারণ যে, এই জিনিসটা শূদ্রদের মধ্যেই বেশি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রাদ্ধের বিশেষ স্থান হল তীর্থগুলি[৪]। গয়াতীর্থ গয়াসুরের নামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। শাস্ত্র বলেন, যেদিন শ্রাদ্ধ করা হয় সেই দিন বৈদিক সন্ধ্যা করতে নেই। শ্রাদ্ধে উপবীত অনেক স্থলে সাধারণ দিকের উলটো বাম দিকে ধারণ করতে হয়[৫]। এইরূপ ভাবে উপবীত রাখার নাম অপসব্য। দক্ষিণ মুখে অপসব্য হয়ে কাজ করতে হবে[৬]। একে প্রাচীনাবীতী হওয়া বলে। প্রাচীনাবীতী হয়ে পিতৃকৃত্য করবে[৭]। বিপরীতোপবীত[৮] হবার নির্দেশ নানা পুরাণেই আছে। বরাহপুরাণও বলেন শ্রাদ্ধে ভাগ্নে, দৌহিত্র, শ্বশুর, জামাতা, মাতুল প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করা প্রশস্ত[৯]; আর অপসব্য হয়ে কাজ করতে হবে[১০]। শ্রাদ্ধে এক হাজার বেদবিৎ ব্রাহ্মণের চেয়ে যোগীদেরই খাওয়ানো শ্রেষ্ঠ।

সহস্রস্যাপি বিপ্রাণাং যোগী চেৎ পুরতঃ স্থিতঃ[১১]।

শিবভক্ত বিষ্ণুভক্তরাও শ্রাদ্ধে বিশেষ মান্য[১২]। যোগীদের পথ বৈদিক নয়। ভক্তরাও অবৈদিক ভাগবত মতের।

দেবযজ্ঞের সঙ্গে সমরূপ করবার জন্য শ্রাদ্ধকে পিতৃযজ্ঞ বলা হল। শ্রাদ্ধকে প্রেতযজ্ঞও বলে। মহাভারতে ও বরাহপুরাণে পিতৃযজ্ঞের উৎপত্তি কেমন করে হল এবং কী তার গুণ তারও আলোচনা আছে[১৩]। শ্রাদ্ধ কে উৎপাদন করলেন, কী জন্য করলেন এবং তা কিমাত্মক—

৪ ঐ ২০, ৩১-৩৬
৫ গরুড় পুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২২, ৪; ২২৩, ১২
৬ কূর্ম, উপরি ২২, ৪১
৭ কূর্ম, উপরি ২২, ৪৫
৮ গরুড় পুরাণ, পূর্ব, ২২২, ৩০; এবং ২২৩, ১২: ইত্যাদি
৯ বরাহ, ১৪, ২-৩
১০ ঐ ১৪, ১৬
১১ ঐ ১৪, ৫০
১২ কূর্ম, উপরি, ২১, ৯
১৩ বরাহ, ১৮৭, ৪

কেন চোৎপাদিতং শ্রাদ্ধং কস্মিন্নর্থে কিমাত্মকম্—১৮৭, ৪*

তার পর শ্রাদ্ধোৎপত্তিবিনিশ্চয়ে[১৪] বলা হয়েছে নিমির বংশে আত্রেয় নামে মহাত্মা জন্মেন[১৫]। সহস্র বৎসর তপস্যা করে আত্রেয় মারা গেলেন। নিমির দারুণ শোক[১৬]। শোক দূর করবার এক উপায় তাঁর মনে হল। তিনি মনে করলেন একটা শ্রাদ্ধকল্প করা যাক[১৭]। পুত্রের প্রিয় সব দ্রব্য দিয়ে তিনি ব্রাহ্মণদের খাইয়ে দক্ষিণাবর্তক্রমে শ্রাদ্ধ করলেন[১৮]। কী ভাবে সেই ক্রিয়া কল্পিত হল তাও সেখানে দেওয়া রয়েছে[১৯]। পিণ্ডসংকল্প শ্রাদ্ধ করে তাঁর মনে পশ্চাত্তাপ হল—এ কী কাজ করলাম। মুনিরা তো কেউ এ কাজ করেন না।

কৃত্বা তু পিণ্ডসংকল্পং পশ্চাত্তাপমকুর্বত।
অকৃতং মুনিভিঃ সর্বং কিং ময়া তদনুষ্ঠিতম্।—বরাহ ১৮৭, ৪০-৪১
মহা, অনু, ৯১, ১৭

পুত্রস্নেহে বুদ্ধিহত হয়ে অশুচিচিত্ত আমি নিবাপ কর্ম (শ্রাদ্ধ কর্ম) পুত্রার্থে করলাম। মুনিরা আমাকে কেন শাপে দগ্ধ করছেন না। দেবাসুরগন্ধর্বপিশাচোরগ-রাক্ষসেরা আমাকে বলবেন কী। পিতৃস্থানীয়গণই বা আমাকে বলবেন কী।

নিবাপকর্ম অশুচিঃ পুত্রার্থে বিনিযোজিতম্।
অহো স্নেহপ্রভাবেন ময়া চাকৃতবুদ্ধিনা॥
কথং মে মুনয়ঃ শাপাৎ প্রদহেয়ুর্নামিতি।
সদেবাসুরগন্ধর্বপিশাচোরগরাক্ষসাঃ
কিং বক্ষ্যন্তি মাং সর্বে যে বৈ পিতৃপদে স্থিতাঃ॥ বরাহ, ১৮৭, ৪১-৪৩
মহা, অনু ৯১

পূর্বে এই শ্রাদ্ধ না দেবতারা না ঋষিরা করেছেন। এর কথা আমি আর কখনো শুনিও নি।

ন চ শ্রুতং ময়া পূর্বং ন দৈবৈশ্চ ঋষিভিঃ কৃতম্। ১৮৭, ৬৪

---

* মহাভারতেও অনুশাসন পর্বে ৯১ অধ্যায়ে এই শ্লোক বা অনুরূপ শ্লোক আছে। বাহুল্য-ভয়ে মহাভারতের শ্লোকগুলির ঠিক সংখ্যা-স্থান নির্দেশ করা হল না। ৯১ অধ্যায়ে তা পাওয়া যাবে।

১৪ বরাহ, ১৮৭, ৬ ১৫ ঐ ১৮৭, ২৫ ১৬ ঐ ১৮৭, ২৮
১৭ ঐ ১৮৭, ২৯-৩০ ১৮ ঐ ১৮৭, ৩১-৩২ ১৯ ঐ ১৮৭, ৩৩-৩৯

ভীত নিমিকে নারদ আশ্বাস দিয়ে বললেন, আপন পিতাকে স্মরণ করো[২০]। পিতা এসে নিমিকে অভয় দিয়ে বললেন, হে তপোধন নিমে, তোমার সংকল্পিত এই পিতৃযজ্ঞকে ব্রহ্মা পিতৃযজ্ঞ নামে একটি ধর্ম বলে নির্দেশ করলেন।

নিমে সঙ্কল্পিতস্তেঽয়ং পিতৃযজ্ঞস্তপোধন।
পিতৃযজ্ঞেতি নির্দিষ্টো ধর্মোঽয়ং ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥—বরাহ, ১৮৭, ৭১
মহা, অনু, ৯১, ২০*

পূর্বে যে-সব যজ্ঞ ছিল তার মধ্যে এটাকেও একটা অতিরিক্ত যজ্ঞ বলে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ততো হ্যতিতরো ধমঃ ক্রতুরেকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
কৃতা স্বয়ম্ভুবা পূর্বং শ্রাদ্ধং যো বিধিবত্তমঃ ॥—বরাহ, ১৮৭, ৭১
মহা, অনু, ২০-২১*

পুরাণের এত আশ্বাসের পরও শ্রাদ্ধের মধ্যে অনেকখানি "কিন্তু" আজও রয়ে গেছে। গয়ালীরা শ্রাদ্ধ করান বলে তাঁরা সমাজে অচল। তাঁদের বলা হয়, প্রেতগুরু। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খাওয়াটা প্রশস্ত নয়। শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করেই অগ্রদানীরা অচল। তাঁদের তাই বলে মহাব্রাহ্মণ। তাঁরা শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করে শুদ্ধ করে দিলে অন্যেরা দান গ্রহণ করতে পারেন। মহাশ্রাদ্ধী ও 'মড়িপোড়া' ব্রাহ্মণ এখনও একটা মহা অবজ্ঞার শব্দ। অথচ বেদসম্মত বলেই যজ্ঞে পশুহননকারী ঋত্বিকেরা মহামান্য, তাঁদের তো কেউ কসাই বলে না।

ক্রমে দেবযানের সঙ্গে পিতৃযানও স্বীকৃত হল। অমাবস্যা হল পিতৃতিথি, গয়া হল পিতৃতীর্থ, শ্মশান হল পিতৃকানন। পূর্বে মাটিতে নিহিত করা ছিল প্রথা, বৈদিক যুগেই দগ্ধ করাও প্রবর্তিত হল, তাই পিতৃগণের মধ্যে কেউ বা অগ্নিদগ্ধ কেউ বা অদগ্ধ।

দগ্ধ হলেও অস্থিগুলি নিয়ে মাটিতে পোঁতা হত, সেখানে যে স্তূপ তৈয়ার করা হত তা দেখা যায় শতপথ-ব্রাহ্মণে[২১]। এই অস্থি মাটিতে পোঁতা দ্বারা

২০ বরাহ, ১৮৭, ৬৬

২১ ১৩, ৮, ২, ১

* মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৮৭-৯২ অধ্যায় কয়টিই শ্রাদ্ধবিষয়ক।

মনে হয় মাটিতে পোঁতাই ছিল প্রাচীনতম নিয়ম। যেখানে এই অস্থি পোঁতা হত তার নাম শ্মশান। শ্মশান অর্থ যেখানে শ্ম অর্থাৎ শব শুয়ে থাকে (শ্মানঃ শবাঃ শেরতে যত্র)। দাহস্থানও শ্মশান বলে অভিহিত হল। শ্মশান এক হিসাবে অতি অপবিত্র, সেখানে চণ্ডালেরই গতিবিধি। হরিশচন্দ্রের সেরা দুঃখ হল শ্মশান-সেবা। আবার শ্মশান সাধনার স্থান, শিবের ও কালিকার ভূমি, সিদ্ধির পীঠ। পুরাতন-নূতন নানা ভাবে শ্মশানের নানারূপ মাহাত্ম্য ও হীনতা।

বেদবাহ্য নানা আচার

হিন্দুদের বিবাহ আট রকমের। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ[২২]। এর মধ্যে গান্ধর্বই বোধ হয় প্রাচীনতম পদ্ধতি, কারণ বরকন্যার মনের আকর্ষণে এই বিবাহ, তাই পাত্রকে বলে বর অর্থাৎ যাকে বরণ করা হয়েছে। এই আট রকমের বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, আর্ষ, দৈব, প্রাজাপত্য মনে হয় বৈদিক। আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহ যে অবৈদিক তা নামেই বুঝা যায়। এর মধ্যে বলে-ছলে বিবাহ হল রাক্ষস ও পৈশাচ এবং পয়সা দিয়ে বিবাহ হল আসুর[২৩]। এখন তো সমাজে আসুর বিয়েই চলেছে, মাঝে মাঝে গান্ধর্ববিধি এসে পড়লে আসুরকে একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তবে কিছুদিন পূর্বেও আসুর বিবাহে কন্যাপক্ষকে পয়সা দিতে হত, এখন দিতে হয় বরপক্ষকে। সেই হিসাবে কন্যার চেয়ে বরের মান্যতা এখন বেড়েছে; তাকে দ্রবিড়সংস্কৃতির উপর আর্যসংস্কৃতির জয় বলা যেতে পারত, কিন্তু অধিকাংশ স্থানে বিবাহের লেনদেন ব্যাপারটা বেশি হয়ে থাকে বরপক্ষের মহিলাদেরই নির্দেশে, কাজেই তাই পুরাপুরি আর্যও একে বলা চলে না। আসুর বিবাহই তো চলেছে, তার মধ্যেই অগ্নি সাক্ষী করে দেবারাধনায় বৈদিক মন্ত্রও উচ্চারিত হচ্ছে। অপূর্ব সমন্বয়! এতে যে মন্ত্র অগ্নি ও দেবতার অপমান হচ্ছে সে কথা ভাববার অবসর কই। তা ছাড়া অন্নপ্রাশন প্রভৃতি কর্মেও অবৈদিক বিস্তর আচার আছে। গর্ভাধান, পুংসবন প্রভৃতি প্রায় অনেক স্থলে এখন দেখাই যায় না। দোল দুর্গোৎসব পালপার্বণ তো সবই অবৈদিক ব্যাপার। তীর্থব্রতও তাই।

---

২২ মনু ৩, ২১; যাজ্ঞবল্ক্য, ১, ৫৮-৬১ ২৩ যাজ্ঞবল্ক্য, ১, ৬১

উপনয়নটা বৈদিক, তান্ত্রিকী দীক্ষাটা অবৈদিক। উপনয়নের সন্ধ্যাগায়ত্রীর সঙ্গে তান্ত্রিকী সন্ধ্যাও করতে হয়। কাজেই আজ আমাদের ধর্মকর্মের মধ্যে অবৈদিক অনেক কিছুই আছে। সর্বত্রই প্রায় অবৈদিক তান্ত্রিক প্রাকৃতাদি ধর্মের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখিয়েছেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে আমাদের দিনচর্যাগুলি প্রায় ঠাসা। এখনকার হিন্দুদের উপনয়নের সময়ে বা বিবাহাদিতে কালে-ভদ্রে বৈদিক গোটা কয়েক মন্ত্র শোনা যায়। পরে দৈনিক জীবনের জন্য বাকি থাকে গায়ত্রীমন্ত্র বা বড়ো জোর সন্ধ্যা-মন্ত্র। তা ছাড়া দেখা যাচ্ছে আমাদের পূজা-পার্বণ, শ্রাদ্ধ-তর্পণ, ব্রত-উপবাস, কৃচ্ছ্রতপস্যা, তীর্থধর্ম সবই এই-সব সে যুগের প্রাকৃত ধর্মের অবশেষ। যাগযজ্ঞের জায়গায় এখন এসেছে সব দেবদেবীর পূজা। সেই-সব দেবতার সঙ্গে সেই যুগের আর্যদের কি কম ঝগড়া গিয়েছে। ভৃগুর বংশ সে যুগে বৈদিক আদর্শের মহাসমর্থক ছিল। তাই শিববিরোধী দক্ষযজ্ঞে ভৃগুর উৎসাহ ও পরে দেবানুচরদের হাতে ভৃগুর বিড়ম্বনা এই দুই কাহিনীই পুরাণ-পাঠক মাত্রই জানেন। বিষ্ণুকে অপমান করবার জন্য ভৃগুই তাঁর বক্ষে করলেন পদাঘাত। সেই ভৃগুপদটি এখনও বিষ্ণুবক্ষ হতে লুপ্ত হয় নি। ক্রমে ইন্দ্রের স্থান বিষ্ণুই অধিকার করলেন। তাই অমরকোষে বিষ্ণুর নাম "ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বা পরবর্তী"—"উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজঃ"।

ঋগ্বেদে 'শিশ্নদেব' কথাটি একাধিকবার মেলে[২৪]। অনেকে বলেন এই শিশ্নদেব কথাটিতে লিঙ্গপূজার বা phallic worship-এর কথাই বলা হয়েছে। আর্যেরা শিশ্নদেবকে পছন্দ করেন নি। কেউ কেউ বলেন চরিত্রহীন শিশ্নপরায়ণদের নিন্দার কথাই সেখানে সূচিত হয়েছে। পরবর্তী সব পুরাণের আখ্যান দেখলে লিঙ্গপূজার সঙ্গে বৈদিক ধর্মের বিরোধটি বেশ ভালো করে চোখে না পড়ে যায় না।

বামনপুরাণে দেখতে পাই তপঃক্লিষ্ট মুনিদের আশ্রমে নগ্নবেশে বনমালা-বিভূষিত হয়ে ভিক্ষাকপাল-হস্তে সর্বাঙ্গসুন্দর যুবক শিব প্রবেশ করলেন।

---

২৪ ৭, ২১, ৫; ১০. ৯৯, ৩

তান্ বিলোক্য ততো দেবো নগ্নঃ সর্বাঙ্গসুন্দরঃ।
বনমালাকৃতাপীড়ো যুবা ভিক্ষাকপালভৃৎ ॥—বামনপুরাণ, ৪৩, ৫৭

মুনিপত্নীরা সর্বাঙ্গসুন্দর যুবা নগ্ন মাল্যধারী শিবকে দেখে মোহিত হয়ে সভ্যতার সব সীমা লঙ্ঘন করলেন[২৫]। মুনিরা আপন আশ্রমেই নিজ নারীদের এরূপ ক্ষোভ দেখে কাঠপাথর নিয়ে "মার মার" করে আক্রমণ করলেন।

ক্ষোভং বিলোক্য মুনয় আশ্রমে তু স্বযোষিতাম্।
হন্যতামিতি সম্ভাষ্য কাষ্ঠপাষাণপাণয়ঃ ॥—ঐ, ৭০

সকলে মিলে শিবের অঙ্গচ্ছেদ করে তবে তাঁকে ছাড়লেন[২৬]। কিন্তু পরে মুনিদের মনে ভয় হল, এবং অবশেষে মুনিপত্নীদের একান্ত অভিলষিত শিবলিঙ্গ-পূজাই প্রবর্তিত হল[২৭]। বহু পুরাণে এই কথা নানা আকারে আছে, সব যদি লেখা যায় তবে ধৈর্য ধরে কেউ পড়তে পারবেন না। কূর্মপুরাণ উপরিভাগে আছে যে নারীবেশধারী বিষ্ণুকে নিয়ে মনোহর বেশে পরমসুন্দর দিগম্বর তরুণ শিব মুনিদের সেবিত দেবদারু-বনে বিচরণ করতে লাগলেন। মুনিকুমার ও মুনিপত্নীরা দেখে কামমোহিত হয়ে নির্লজ্জ আচরণ করতে লাগলেন[২৮]। মুনিরা বিরক্ত হয়ে শিব ও বিষ্ণুকে শাপ দিতে লাগলেন[২৯]। যষ্টিমুষ্টিদ্বারা তাড়না করেও[৩০] মুনিরা পরিশেষে শিবপূজা গ্রহণ করতেই বাধ্য হলেন।

স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ও নাগর-খণ্ড প্রথম অধ্যায়ে, লিঙ্গপুরাণে পূর্বভাগে ৩৭শ অধ্যায়ে, বায়ুপুরাণে পূর্বভাগে ৫৫তম অধ্যায়ে এই শিব-কাহিনীই নানাভাবে বর্ণিত আছে। শিবপুরাণে ধর্মসংহিতায় দশম অধ্যায়ে দেখা যায় শিবই আদি দেবতা, তাই কামার্তা মুনিপত্নীরা সুরতপ্রিয় শিবকে চান। মুনিরা কামাতুরা পত্নীদের সামলাতে পারেন না। ভৃগু মুনি বৃথাই ধর্মের দোহাই দেন, অবশেষে মুনিরা শিবকে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। এরূপ কথা আরও বহু স্থানে আছে। আর বলার প্রয়োজন নেই।

মুনিপত্নীরাই খুব সম্ভব শিবপূজাপ্রবর্তনের মূলে, কিন্তু তার হেতু হয়তো মাত্র

---

২৫ বামনপুরাণ, ৫৩, ৫৯-৬৯
২৬ বামনপুরাণ, ৭১ ২৭ ঐ, ৪৩-৪৪ অধ্যায়
২৮ ঐ, ৩৭, ১৩-১৭ ২৯ কূর্ম ৩৭, ২২ ৩০ ঐ, ৩৭

কাম নয়। শিব ছিলেন শূদ্রের দেবতা। শবর ও কিরাতদের দ্বারা পূজিত শিব ছিলেন কিরাতবেশী, শিবানী ছিলেন শবরী মূর্তি, এই-সব কথা নানা পুরাণেই মেলে। আর্যেরা যখন ভারতে এলেন তখন তাঁদের সঙ্গে নারীর সংখ্যা ছিল কম। সেই যুগে মুনিরা বহু ক্ষেত্রেই অনার্য কন্যাদের যে বিবাহ করেছেন সেই-সব কথা নানা শাস্ত্রেই দেখতে পাই। তাই ব্রাহ্মণপত্নী হলেও নারীরা শূদ্র। ব্রাহ্মণকন্যা হলেও এখন ব্রাহ্মণপত্নীরা শূদ্র বলেই গণ্য। সেইজন্যই মুনিপত্নী হয়েও নারীরা তাঁদের পৈত্রিক উপাস্য দেবতাকে স্বীকার করেছেন। মুনিরা হয়তো তাতে বাধা দিয়েছেন কিন্তু ক্রমে মুনিপত্নীদের মধ্য দিয়েই চারি দিকের প্রাকৃত ধর্ম মুনিদের মধ্যেও এসে পড়েছে। এই-সব গণদেবতার প্রচণ্ড স্রোতকে বাধা দিতে বহু চেষ্টা করেও মুনিরা পারেন নি।

এখনও কিন্তু এই কথাটি সকলে জানেন যে, শূদ্র-দেবতার কাছে ব্রাহ্মণের মাথা নত করা অনুচিত। তাই শূদ্রেরা শিব বা বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করবার সময় নিজেরা দেবপ্রতিষ্ঠা না করে প্রতিষ্ঠার কাজটা করান আপন পুরোহিত বা গুরুকে দিয়ে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা শূদ্র-দেবতাকে ব্রাহ্মণ-দেবতা করা হয়[৩১]। এতেও প্রাচীন যুগের শূদ্র-দেবতার সঙ্গে বিরোধের কথাই মনে আসে।

ঋগ্বেদে 'শিব' নামক একদল লোকের কথা পাওয়া যায়[৩২]। এই-সব আদিম মানবদের পূজ্য দেবতাই কি শিব ছিলেন। গণপতিও তো গণের দেবতা, তিনি বিঘ্ননাশন। অর্থাৎ যজ্ঞের বিঘ্ন নাশ করবার জন্য গণপতিকে সর্বযজ্ঞের আদিতে পূজা করতে হয়। হব্যকব্য মন্ত্রের মধ্যে অসুর-দানব-যক্ষ-রক্ষ-পিশাচ-যাতুধানদের মেরে সরিয়ে দেবার কথা এখনও উচ্চারণ করতে হয়।

ওঁ নিহন্মি সর্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ হতাশ্চ সর্বেঽসুরদানবা ময়া।
রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসংঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্বে ॥৩৩

চারি দিকে যে অগণিত মানবমণ্ডলী তাদের সঙ্গে ক্রমাগত বিরোধ আর কতকাল চলে। তাই ক্রমে তাদের দেবতার পূজাকে যজ্ঞের আরম্ভে স্বীকার করে নিয়ে যজ্ঞগুলিকে নির্বিঘ্ন করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সবাই বুঝতে

---

৩১ Bhattacharya, Hindu Tribes and Castes, 1896, pp. 19-20

৩২ ৭, ১৮, ৭

৩৩ পুরোহিতদর্পণ, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৫৭৭

পারলেন। তাই যজ্ঞারম্ভে বিঘ্ননাশন গণদেবতা অর্থাৎ প্রাকৃতজনের দেবতা গণেশের পূজা প্রতিষ্ঠিত হল। হোমাগ্নির পাশে শালগ্রাম শিলা স্থান পেল। হনুমানের পূজা সকল কর্মারম্ভে পশ্চিমভারতে এখনও তাই সকলের করণীয়। যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায়[৩৪] তৈত্তিরীয় সংহিতায়[৩৫] কাঠক সংহিতায়[৩৬] এই কারণেই রুদ্র ও শিবকে স্বীকার করে গণ-চিত্তের অনুকূলতা প্রার্থনা করা হয়েছে। অথর্ববেদেও বহু স্থলে এই চেষ্টার পরিচয় মেলে[৩৭]।

এই চেষ্টার একটি চমৎকার উদাহরণ এইখানে দেওয়া যাক। বহুদিন পূর্বে একবার পাশুপতধর্মের আলোচনা উপলক্ষ্যে আমাকে গুজরাতে বড়োদা রাজ্যের অন্তর্গত কারবণ নামে গ্রামে যেতে হয়েছিল। এই গ্রামটি শৈবদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে এক মন্দিরের বাইরে পাথরে খোদিত একটি মসজিদের মূর্তি দেখতে পেলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্থানীয় প্রাচীন লোকেরা বললেন মুসলমান-যুগে মুসলমানদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য মন্দিরের বাইরে পাথরের গায়ে এই মসজিদের মূর্তিকে খোদিত করতে হয়েছিল। যে স্বীকৃতির জোরে কারবণের মন্দিরগুলি মুসলমানদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, ঠিক সেই কারণেই যজ্ঞের আরম্ভে শিব-বিষ্ণু-গণেশাদির পূজা স্বীকার করতে হয়েছিল।

এখন আমাদের বৈদিক সন্ধ্যার সঙ্গে তান্ত্রিক সন্ধ্যা চলে। গুজরাত প্রভৃতি স্থানে দেখেছি ব্রাহ্মণদের সব কুলদেবী আছেন, প্রায়ই তাঁদের মূর্তি কূপের ভিতরে প্রাচীরের সঙ্গে গাঁথা,—এই ভাবে মূর্তিগুলিকে সকলের দৃষ্টি ও আক্রমণ হতে রক্ষা করা হয়েছে। এখন আমাদের এই-সব অবৈদিক দেবতা ও আচার সব মিলে মিশে বৈদিক বলেই চলে যাচ্ছে। কাজেই দেবীমাহাত্ম্যেও দেবীকে বেদবন্দিতা বলতে শোনা যায়। পরমপণ্ডিত তুলসীদাসও রামবিরোধীদের নিরসন করবার সময় রামভক্তির পথকে বলেছেন "শ্রুতিসম্মত হরিভক্তিপথ"[৩৮]।

অনার্য দেবতাদের যখন আর্যেরা স্বীকার করতে লাগলেন তখন ক্রমে সেই-সব অনার্য দেবতার পুরোহিতের স্থলেও ব্রাহ্মণেরা এসে বসতে লাগলেন। তবু

৩৪ ১৬, ৪০-৪৭ ৩৫ ৪, ৫, ১-১১ ৩৬ ১০, ১১, ১৬

৩৭ ৪, ২৯ ; ৭, ৪২ ; ৭, ৯২ ইত্যাদি

৩৮ রামচরিতমানস, উত্তর, দোহা ১৫৯

অনার্য যুগের পৌরোহিত্যের প্রাচীন ব্যবস্থার অবশেষ এখনও অনেক স্থলে দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতে মাতৃতন্ত্রতারই ছিল প্রবলতা। সেখানে নারীরাই প্রধান। এককালে সেখানে পুরোহিতও ছিলেন নারীরা। নারীরা দেবারাধনার অঙ্গস্বরূপে দেবতার কাছে নৃত্যগীতও করতেন। ক্রমে পূজার অংশটুকু ব্রাহ্মণদের হাতে চলে এল। এখন শুধু পূজাঙ্গরূপে নৃত্যগীতটুকু করে নারীরা হয়ে রয়েছেন দেবদাসী। দেবদাসী-প্রথা আজ অতিশয় হেয় ও মলিন হয়ে পড়েছে কিন্তু একসময় সেই-সব দেবতার পুরোহিতই হয়তো ছিলেন নারীরা। দেবদাসী-প্রথার দুর্গতির মধ্যে এখনও সেই পুরাতন যুগের নারীদের গৌরবময় অধিকারের একটু সূচনার অবশেষ আছে। যেমন "দেবর" কথার মধ্যে বৈদিক যুগে যে নারীরা পতির মৃত্যুর পর সহমৃতা না হয়ে দেবর বা দ্বিতীয় বরকে নিয়ে ঘর করতেন তার একটু সূচনা রয়ে গেছে।

মহাভারতে দেখতে পাই যখন দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সহদেব মাহিষ্মতী পুরীতে গেলেন তখন দেখলেন যে সেখানে বৈদিক দেবতা অগ্নি পৌঁচেছেন বটে তবে অগ্নিকে জ্বালাবার ভার তখনও সে দেশে মেয়েদেরই উপর। অগ্নি সেখানে মেয়েদের চারু ওষ্ঠের ফুৎকার ছাড়া জ্বলেন না[৩৯]। সেখানে নারীরা স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাচারিণী স্বৈরিণী[৪০]।

দক্ষিণ-ভারতে এখনও বহু অনার্য জাতির গুরুতা ব্যবসা আছে। শূদ্র হলেও শূদ্র দাসরীরা বহু জাতির গুরু[৪১]। ইরালিগা জাতিরা বনদেবীর পূজক, ইহাদের পূজারি বলে। নারীদেবতার পূজক মাদিগারা অতিশয় হীন জাতি[৪২]। মাদিগাদের নারীদের মাতঙ্গী বলে। দেবীর এক নাম মাতঙ্গী। ত্রিবাঙ্কুরের অরণ্যবাসী কানিকর জাতি দেবীর পূজক, মীন ও কন্যাতে অর্থাৎ চৈত্রে ও বসন্তে ইহাদের প্রধান দেবীপূজা[৪৩]।

---

৩৯ সভাপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ ৩১, ২৯ ৪০ ঐ, ৩১, ৩৮

৪১ Nanjundayya and A. K. Iyer, Mysore Tribes and Castes, Vol. III p. 117

৪২ Ibid., p. 157

৪৩ E. Thurston, Castes and Tribes of Southern India, Vol. III. p. 170

জগন্নাথ-মন্দিরে প্রাচীনকাল হতে শবরজাতীয় "দৈত"রা সেবা করে আসছেন। অথচ এখন উড়িষ্যার পাণ-কণ্ড্রা প্রভৃতি হীন জাতিদের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ নেই। হয়তো এইভাবে আমরা যে-দেবতাকে অনেক বিরুদ্ধতার পরে গ্রহণ করেছি তাঁর পূজায় আমরা আদি-প্রবর্তকদেরই বঞ্চিত করছি। তামিলদেশের অত্যন্ত শুদ্ধাচারী কোনো কোনো শৈবমন্দিরে বিশেষ বিশেষ উৎসব-দিনে অস্পৃশ্য পারিয়ারা প্রভুত্ব করেন[৪৪]। দক্ষিণ কর্ণাটে নাপিত কেলসারা শূদ্রদের কোনো কোনো ধর্ম-অনুষ্ঠানের পুরোহিত হয়ে থাকেন[৪৫]।

শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তগণের মধ্যে অনেকে অন্ত্যজ ও হীনজাতীয়। আচারীদের অনেক আদিগুরুও হীনজাতির মানুষ। সাতানীরা বৈষ্ণব মন্দিরের সেবক, তাঁরা "সাত্তাদবন" অর্থাৎ শিখাসূত্রহীন। রামানুজও বিষ্ণুমন্দিরে এই শূদ্রগণের সেবা অনুমোদন করেছেন[৪৬]।

১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে মধ্যভারতে এক মুচি বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করেন। তার বিবরণ এখন প্রাচীন লেখ দেখে পাওয়া গেছে[৪৭]।

এখন শিব বিষ্ণু দেবী প্রভৃতি সবার পূজ্য হলেও সে-যুগে যে-সব ব্রাহ্মণ এই-সব দেবতার পৌরোহিত্য স্বীকার করেছিলেন তাঁরা এখনও অপাংক্তেয়। মারক ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণু মন্দিরের পূজক হয়ে ব্রাহ্মণত্ব হারিয়েছেন[৪৮]। গুজরাতে শিবমন্দিরের পুরোহিত তপোধনরা অত্যন্ত হীন[৪৯]। দক্ষিণ দেশের শিবনাম্বী বা শিবারাধ্যগণ শিবমন্দিরের পূজারি হওয়ায় ব্রাহ্মণ হয়েও সমাজে অচল[৫০]। শিবধ্বজগণ স্মার্ত-সম্প্রদায়ের শিবমন্দিরে পূজারি ব্রাহ্মণ হলেও সমাজে তাঁদের স্থান নেই। কোচিন ত্রিবাঙ্কুরের শিবপূজক ব্রাহ্মণদের অবস্থা এর চেয়ে একটু

৪৪ Ghurye, Caste and Race in India, pp. 26-27

৪৫ Castes and Tribes of Southern India, Vol, III, p. 269

৪৬ Mysore Tribes and Castes, Vol. VI, p. 591

৪৭ Epigraphia Indica, Vol. II, p. 229; Caste and Race in India p. 99

৪৮ Ibid., p. 310

৪৯ Wilson, Indian Castes, Vol. II, p. 122

৫০ Mysore Tribes and Castes, Vol. II, p. 318

ভালো হলেও বিশেষ ভালো নয়। দেবাংশ বা শিবপূজক বলে তাঁদের প্রাধান্যের দাবি পরবর্তী সমাজ-ব্যবস্থায় নামঞ্জুর হয়েছে। এখন তাঁরা কাপড় বুনে জীবিকা নির্বাহ করেন[৫১]। মুস্সাদরা ব্রাহ্মণই ছিলেন, এখনও আচার-বিচারে তাঁরা বিশুদ্ধ নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের সমান, সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে তাঁরা প্রবীণ পণ্ডিত, কিন্তু দ্বাপর যুগে শিবনির্মাল্য খেয়ে তাঁরা আজও পতিত হয়ে আছেন[৫২]। দক্ষিণ-ভারতে তুলুব নামে এক জাতি আছে। তাদের মধ্যে কোনো নারী যদি কোনো কারণে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান তবে তার সোজা রাস্তা হচ্ছে শিবমন্দিরে গিয়ে একটু শিবনির্মাল্য খাওয়া। তবেই তাঁর সামাজিক বাঁধন ও মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়[৫৩]। এতকালে শিব যদিও দেবতা বলে আর্যদের দ্বারা গৃহীত হয়েছেন শিবের নির্মাল্য তবু আজও তেমনি অচল রয়েছে। চিদম্বর তীর্থের নটরাজ-মন্দিরে প্রবেশ করবার পথে ভক্তপ্রবর নন্দনারের মূর্তি আছে। নন্দনার ছিলেন জাতিতে অস্পৃশ্য পারিয়া। নন্দনারের মূর্তি ও তাঁর ভক্তিসংগীত পূজ্য। কিন্তু নন্দনার ও পারিয়া জাতি আজও অস্পৃশ্য।

শাস্ত্রানুসারে গ্রাম্যদেবতার পূজা নিষিদ্ধ, মনু বহুবার সেই-সব দেবতার পূজকদের পতিত বলেছেন[৫৪]। হোলি বা দোলকে শূদ্রোৎসব বলে। তাতে যে-সব অশ্লীল গান হয় তা যে কিছুতেই আর্য নয় সে কথা সহজেই বোঝা যায়। হোলির আগুন এখনও ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্যদের কাছে থেকেই আনতে হয়। বেরারের কুনবীরা এই সময় অস্পৃশ্য মহারের ঘর হতে আগুন আনতে বাধ্য হন[৫৫]।

দেবীপূজাতেও নারীদের গীতবাদ্য চাই[৫৬] এবং নারীদের সেই সময় অত্যন্ত অশ্লীল গান করা[৫৬ক] দরকার। সেই-সব গান যে কী রকম অশ্লীল হতে হবে সে-ব্যবস্থাও সেখানে দেওয়া আছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

---

৫১ Mysore Tribes and Castes : Vol. III. p. 137

৫২ Castes and Tribes of Southern India, pp. 120-22

৫৩ Ibid, p. 81 ; Mysore Tribes and Castes, 1 ; p. 218

৫৪ ৩, ১৫২ ; ৩, ১৮০

৫৫ Ghurye, Caste and Race in India, p. 26

৫৬ দেবী ভাগবত ৩, ১৬, ৩৬ ৫৬ক বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, পূর্ব খণ্ড, ২২,৩৩

সিন্দূর এখন পূজায় লাগে, অথচ এটা নাগদের কাছে পাওয়া জিনিস। নাগ শব্দের অর্থ সিন্দূরও হয়। সিন্দূর দানের যে মন্ত্র পুরোহিতদর্পণে দেখা যায় তার সঙ্গে সিন্দূরের কোনো সম্পর্ক নেই। সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় ঘটস্থাপনে যে সিন্দূর দানের মন্ত্র[৫৭] দেখা যায় তা সিন্ধু নদীর ধারার সঙ্গে তুলনার কথা। শুধু শব্দসাম্যে তাই দিয়ে সিন্দূরের অনুষ্ঠানমন্ত্র চালিয়ে নিতে হয়েছে। সামবেদীদের অধিবাস-অনুষ্ঠানের স্বস্তিক, শঙ্খ, রোচনা, শ্বেত সর্ষপ, তাম্র, চামর দর্পণাদির যে যে মন্ত্র তার সঙ্গে ঐ-সব জিনিসের কোনোই সম্পর্ক নেই। পূজা কথাটাই দ্রাবিড়।

ভক্তির উদ্ভব দ্রবিড়দেশে। পদ্মপুরাণে দেখা যায় ভক্তি বলছেন, "আমার জন্ম দ্রবিড়ে, বৃদ্ধি কর্ণাটে, কিছুকাল স্থিতি মহারাষ্ট্রে, জীর্ণতা গুজরাতে।"

উৎপন্না দ্রবিড়ে চাহং কর্ণাটে বৃদ্ধিমাগতা।
স্থিতা কিঞ্চিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা ॥[৫৮]

বিষ্ণুপুরাণেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়, কারণ ভক্তির উপদেষ্টা কালিঙ্গ বা কলিঙ্গদেশীয়[৫৯]। এই ভক্তি প্রবর্তিত কলিতে, তাই কলিযুগ ধন্য। এই যুগে নামকীর্তনেই ইষ্টসিদ্ধি ঘটে[৬০], নারী ও শূদ্রগণও সহজেই ইষ্টসিদ্ধি লাভ করেন তাই তাঁরাও ধন্য[৬১]।

হিন্দীতেও ভক্তদের কথায় আছে ভক্তির উৎপত্তি দ্রবিড়ে, উত্তরভারতে তা এল রামানন্দের কৃপায়।

মাত্র এখনকার মানদণ্ড অনুসারে ভারতবর্ষকে বিচার করলে ভুল হবে। এখন মনে হয় যেন সে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তার সব পুরাতন উদারতা হারিয়ে ফেলেছে। তখনকার দিনে সে অনেক বাইরের জিনিস আপন করে নিতে পেরেছে।

ফলিত জ্যোতিষও অনেকখানি আমাদের বাহির হতে সংগৃহীত বস্তু।

---

৫৭ পুরোহিতদর্পণ, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ৮ম সংস্করণ, পৃ ৮, ১০

৫৮ পদ্ম, উত্তরখণ্ড, ৫০-৫১

৫৯ ৩, সপ্তম অধ্যায়

৬০ বিষ্ণু ৬, ২, ৩৯

৬১ ঐ ৬, দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের পুরাণে জ্যোতিষ ছিল গণিতসিদ্ধ। আমাদের জ্যোতিষ ছিল যাগযজ্ঞের কালনির্ণয়ের জন্য বা সেই প্রসঙ্গে শুভাশুভ ফল নির্দেশের জন্য। পরে গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য আচার্যদের থেকে ভারতে এল তাঁদের ফলিত জ্যোতিষ। তখনকার সনাতনধর্মীরা তাতে বিস্তর বাধা দিয়েছেন। তাই বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায়[৬২] দেখি "যবনরা যদিও ম্লেচ্ছ তবু তাঁদের মধ্যে এই ফলিত শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অবস্থিত। তাঁরাও ঋষিদের মতোই পূজিত। তবে যাঁরা দৈববিৎ ফলিত-জ্যোতিষবাদী ব্রাহ্মণ তাঁরা কেন পূজিত না হবেন।"

> ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
> ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে কিম্পুনর্দৈববিদ্ দ্বিজঃ॥—বৃহৎসংহিতা, ২, ১৫

এখনো জ্যোতিষের 'হোরা' 'দ্রেক্কাণ' প্রভৃতি কথাগুলি গ্রীক। বরাহ-মিহিরকৃত বৃহৎসংহিতার ভূমিকাতে কার্নসাহেব এইরূপ ছত্রিশটি গ্রীক শব্দের তালিকা দিয়েছেন যা সংস্কৃত না হয়েও ভারতীয় জ্যোতিষে চলছে। সে-সব শব্দ গ্রীকদের থেকে পাওয়া[৬৩]। যাঁর দেখবার ইচ্ছা তিনি সেখানে দেখতে পারেন। Weber মনে করেন ভারতীয় জ্যোতিষের প্রমাণরূপে ধৃত আচার্য মনীত্থ হলেন Manetho, তাঁর গ্রন্থের নাম Apostelemata[৬৪]। কার্ন এই বিষয়ে বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার চৌষট্টি পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় অনেক তথ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

জ্যোতিষে তিনটি স্কন্ধ। হোরা বা জাতক স্কন্ধ, গণিত স্কন্ধ, সংহিতা স্কন্ধ। তার মধ্যে সংহিতা স্কন্ধের এবং গণিত স্কন্ধের অধিকাংশ ভারতীয় যদিও তাতেও কতক পরিমাণে গ্রীক প্রভাব দেখা যায়। হোরা বা জাতক স্কন্ধটা প্রায় সম্পূর্ণই গ্রীকদের থেকে পাওয়া। এইজন্যই আমাদের পুরাণের সঙ্গে পরবর্তী জ্যোতিষের অনেক জায়গায় অমিল দেখা যায়; পুরাণের মতে চন্দ্র হলেন তারাপতি, শুক্র হলেন দৈত্যগুরু, কাজেই পুরুষ। কিন্তু যেহেতু Diana (গ্রীকদের চন্দ্র) এবং Venus (গ্রীকদের শুক্র) গ্রীকদের মধ্যে

---

৬২ বৃহৎসংহিতা, A. S. B. ২, ১৫

৬৩ ঐ ভূমিকা, পৃ ২৮

৬৪ ঐ পৃ ৫২

নারী তাই ফলিত জ্যোতিষে চন্দ্র এবং শুক্র স্ত্রীগ্রহ। এটা ভারি অদ্ভুত। সবার সঙ্গে বরাহ নিজেও তাঁর হোরাশাস্ত্রে এই অদ্ভুত কথার উল্লেখ করেছেন[৬৫]।

আমাদের পুরাণে দেখা যায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপর গ্রহাদির বা দেবতাদের কোনো প্রভুত্ব নেই। মানুষের জীবনে ফলাফল নির্ভর করে তার কর্মের উপর। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষে কর্মকে অতিক্রম করে গ্রহাদির ফলাফলই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই হল গ্রীক মত। আমাদের ফলিত জ্যোতিষে গ্রীকদের মতই নেওয়া হয়েছে। বরাহমিহির এই অসংগতিতে সামঞ্জস্য করবার প্রয়াস করেছেন তাঁর হোরাশাস্ত্রে[৬৬]। আচার্য উৎপল এ বিষয়ে আরও বেশি প্রয়াস করেছেন।

অভারতীয় গ্রীক শব্দ কী ভাবে ফলিত জ্যোতিষে এসেছে তার দৃষ্টান্ত হোরাশাস্ত্রের একটি শ্লোক দেখলেই বোঝা যায় :

ক্রিয়তাবুরিজিতুমকুলরিলেয় পার্থোনজ ককোর্পাথ্যাঃ।
তৌক্ষিক আকোকেরো হৃদরোগশ্চের্থসিঃ ক্রমশঃ ॥—১, ৮

হোরাশাস্ত্রে যবনাচার্যদের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে— ময়যবনমাণিত্থশক্তিপূর্বৈঃ ইত্যাদি শ্লোকে[৬৭]। প্রাহুর্যবনাঃ স্বতুঙ্গগৈঃ প্রভৃতি শ্লোকেও[৬৮] বরাহমিহির সেই কাজই করেছেন। দ্রেক্কাণরূপং যবনোপদিষ্টম্[৬৯] প্রভৃতি বহু বহু স্থলে সেই একই কথা।

তখনকার দিনে সনাতনীরা এই নবাগত ফলিত জ্যোতিষের বিরুদ্ধে বহু রকম চেষ্টা করেছেন অথচ আজ সারা ভারতে সেই ফলিত জ্যোতিষেরই জয়জয়কার। মহাসনাতনী ভৃগুর নামেও বিদেশী এই ফলিতজ্যোতিষবিদ্যা এখন চলেছে। বিদেশ হতে জ্যোতিষ যাঁদের দ্বারা আনীত আজও তাঁরা কিন্তু সমাজে ঠিক স্থান পান নি। নক্ষত্রদর্শকেরা পংক্তিতে সবার সঙ্গে বসে আহার করবার যোগ্য নন[৬৯ক]। শ্রাদ্ধে তাই তাঁদের নিমন্ত্রণ করা অনুচিত[৭০]।

৬৫ হোরাশাস্ত্র ২, ৬ ৬৬ ঐ ১, ৩ ৬৭ ঐ ৭, ১
৬৮ হোরাশাস্ত্র ১১, ১ ৬৯ ৩৫, ২
৬৯ক মহাভারত অনু ৯০, ১১
৭০ কূর্ম, উপরি, ২১, ৩৭

গ্রহবিপ্ররা নামে বিপ্র হলেও সমাজে তাঁদের স্থান একটুও ভালো নয়। তাঁরা সূর্যপূজক ছিলেন। সেই সূর্য ক্রমে বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। কিন্তু গ্রহবিপ্রদের স্থান আজও ভালো হতে পারল না। সূর্য বা গ্রহের নামে আমাদের বারের নাম যথা রবি সোম মঙ্গল এও খুব পুরাতন নয়। একটি মস্ত জিনিস দেখতে পাই যে দেবতা যেখান হতেই আসুন না কেন এ দেশে সেই দেবতার ধ্যানধারণা ক্রমে ভাগবত সব সাধকের সাধনার বলে এত উচ্চ ও পবিত্র হয়ে উঠেছে যে আজ সকল জগতের কাছে গৌরবের সঙ্গে তা ধরা যায়। ইংরেজিতে একে বলা হয় sublimation বা শুদ্ধীকরণ।

ভক্ত ও ভাগবতদের উদারতা

এই যে এত-সব জিনিস বাহির হতে ক্রমে আমাদের মধ্যে আসতে পেরেছে তার মূলে হচ্ছে ভক্তিপ্রধান ভাগবতদের চেষ্টা। বেদপন্থী যাগযজ্ঞপরায়ণ আর্যেরা এ কাজ করতে পারেন নি। আসাযাওয়ার পথ বন্ধ হলে ক্রমে জাতটা মরে যায়। ভাগবতরা এই ভাবে গ্রহণ করবার দ্বার খুলে রেখে জাতিকে ও সাধনাকে জীবন্ত রেখেছেন। ধ্যান ও ধারণার দ্বারা নবাগত সেই-সব দেবতাকে ক্রমে তাঁরা পবিত্র মহান ও বিরাট করে তুলেছেন। আমাদের শিবের ধারণা ক্রমে যেরূপ অপূর্ব হয়ে উঠেছে তার তুলনা কোথাও মেলা দুষ্কর। যোগে-ধ্যানে-তপস্যায়-প্রেমে শিব অতুলনীয়। প্রেমে-মাধুর্যে-মাহাত্ম্যে বিষ্ণুনারায়ণ সকলের অন্তরের ধন।

বাহিরের সঙ্গে যোগ হচ্ছে জীবনের ধর্ম। তাতে বাধা দিলেই ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে জাতিকে অধিকার করে। এককালে ভারত দেশেবিদেশে সমুদ্রপথে গিয়েছে, উপনিবেশ করে সংস্কৃতির যোগস্থাপন করেছে। যেই সে এই যোগপথটি নিষিদ্ধ করে দিল অমনি দেখতে দেখতে প্রবল বিদেশী প্রভাব তার ঘরে এসে উপস্থিত হল। যোগভ্রষ্ট দুর্বল দেশ তাতে বাধাও দিতে পারল না। যে-বিপদকে সে বাইরে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল সেই বিপদ বসল তখন তার ঘর জুড়ে। প্রাচীন ভারতে যখন দেশে জীবন ছিল তখন নানা দেশে গিয়ে

ভারতীয়েরা পরকে আপন করছেন এবং ভারতে আগত পরকেও আত্মীয় করে নিতে এবং স্বীকার করতে পেরেছেন।

চিরদিন ভারতে আগত নানা জাতিকে ভাগবতেরাই আপন করে নিতে পেরেছেন। পরকে আপন করতে না পারলে মানুষের কিছুতেই চলে না। অথচ ক্রিয়াকাণ্ড-শাস্ত্রনিয়ম-আচারবিচারের পথে পরকে আপন করার কাজ সম্ভব নয়। ভক্তিতে ও প্রেমেই সেই যোগটি ঘটে। গ্রীকেরা ভারতের মধ্যে এসেও পর হয়ে থাকতেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে ভাগবতেরা তাঁদের ঘরের লোক করে তুললেন। বেসনগরে প্রাপ্ত খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর এক শিলালেখে দেখা যায় তক্ষশিলাবাসী ডিয়সের পুত্র হেলিয়োডোর পরম বৈষ্ণব হয়ে বিষ্ণুমন্দিরের গরুড়ধ্বজ তৈরি করিয়ে দিচ্ছেন। শক-হূণ-যবচী প্রভৃতি জাতির লোকেরা ক্রমে শিবভক্ত হয়ে আমাদের আপন হয়ে গেছেন। কেডফাইসস তাঁর অমন সাংঘাতিক বিদেশী নাম সত্ত্বেও পরম-মাহেশ্বর হয়ে গিয়েছেন। বৌদ্ধরাও এই আত্মীয়তা স্থাপনে অনেক সাহায্য করেছেন। কনিষ্ক হুবিষ্ক প্রভৃতি কত কত পরাক্রান্ত নরপতি ভক্তির পথ দিয়ে এ দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বৈদিক কর্মকাণ্ডের পথে তাঁদের আসা অসম্ভব ছিল।

এই রকম করে ভক্ত ভাগবতগণের চেষ্টায় ক্রমে আর্য-অনার্য পুরাতন-নূতনের মধ্যে যোগ স্থাপিত হয়ে চলেছিল এমন সময় ভারতে এলেন মুসলমানেরা। রাজ্যজয়ের জন্য মুসলমান রাজরাজড়ার আসবার আগেই এসেছেন সাধক মুসলমানের দল। তলওয়ার ও রাজ্যজয়ের দ্বারাই এ দেশে মুসলমান ধর্মের প্রচার হয়েছে এ কথা মনে করা ভুল। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের আদর্শ নিয়ে দুই দল তপস্বীই সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। এই উপলক্ষে হিন্দুরাও তাঁদের পুরাতন অথচ বিস্মৃত সব বড়ো বড়ো সত্য ও আদর্শকে সবার সামনে স্থাপন করলেন। এই আদর্শের সাধনা ও সিদ্ধি দিয়েই সাধকেরা সকলকে আপন পথে ডাক দিতে লাগলেন। অবশ্য বিজেতার ধর্মগ্রহণ ক'রে যে-সব সুবিধা আছে তার লোভে বা নিগ্রহের ভয়ে অনেকে যে ধর্মান্তর গ্রহণ না করেছেন তা নয়, কিন্তু সে-সব কথা হল রাজনীতিক্ষেত্রের। সাধনার হিসাবে দেখলে আমরা তখন দুই ধর্মের দুইটি আদর্শকে নিয়ে বড়ো বড়ো সব সাধকদেরই দেখতে পাই। ভূমিকাতেই বলা হয়েছে হিন্দু কথার মানেই ভারতীয় ধর্ম। তা বৈদিক বা

অবৈদিক বা দল-বিশেষের কোনো জিনিস নয়। ভারতের অর্থাৎ হিন্দ-এর এই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নানা ধর্মের মিলনে যে ধর্ম ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাই ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু। ভারতে আগত বা ভারতে উৎপন্ন সকল ধর্ম ও সংস্কৃতিরই এই সমন্বয়ের মধ্যে স্থান আছে।

প্রাচীনকাল হতেই হিন্দুধর্ম ভারতের নানা সাধনার সমন্বয় সাধন করেছে। হিন্দুরা স্বভাবতই খুব উদার। দক্ষিণ-ভারতে যখন খ্রীস্টানেরা এলেন তখন তাঁরা রাজ্য জয় করেন নি। দক্ষিণের হিন্দু রাজারা সেই-সব খ্রীষ্টীয় সাধকদের ব্রহ্মোত্তরের মতো ভূমিবৃত্তি দিয়ে খ্রীস্টধর্ম সাধনার পথ সহজ করে দিয়েছেন। পারসীরা যখন আপন ধর্ম রক্ষার জন্য পারস্যদেশ ছেড়ে জাহাজে করে গুজরাতে এলেন তখন যদু রাণা তাঁদের ভূমি ও আশ্রয় দিয়ে সর্বভাবে সাহায্য করলেন। পারসীরা রাজ্যজয়ী হয়ে তো এ দেশে আসেন নি। মুসলমান ভক্তদের জন্য দেবী অনুপমা যে চৌরাশিটি মসজিদ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন সে কথা আমরা জৈনদের পুরাতন-প্রবন্ধগ্রন্থে[৭১] দেখতে পাই। মুসলমান জয়ের বহু পূর্বে মুসলমান সাধকদের জন্য হিন্দু রাজাদের ভূমিদানের বহু প্রমাণ প্রাচীন সব লেখে পাওয়া গেছে। কাজেই রাজ্য জয় করেই যে মুসলমান ধর্ম ভারতে স্থান পেয়েছে সে কথা ঠিক নয়। ভারতের এই উদার আতিথ্যের দ্বার চিরদিনই উন্মুক্ত ছিল। রাজনৈতিক সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখলে সে কখনও কাকেও এই ভাবে ঘরে ঢুকতে দিত না।

নদী যেমন সাগরের দিকে অগ্রসর হবার পথে ক্রমে ক্রমে এক-একটি করে নদীর ধারা পায় এবং তাকে আত্মসাৎ করে ক্রমে পুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলে তেমনি ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতি যুগের পর যুগে নব নব সংস্কৃতিকে পেয়ে তাদের অস্বীকার বা নষ্ট না করে, বরং তাদের সংস্কৃতিগত সম্পদ্ সব সাদরে আত্মসাৎ করে আপনার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যকে ক্রমাগতই বাড়িয়ে চলেছিল। দ্রাবিড়, শক, গ্রীক প্রভৃতি বহু সভ্যতাই ক্রমে এই বিরাট ধারাতে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু মুশকিল বাধল যখন মুসলমানেরা ভারতে এলেন। তাঁদের ধর্ম চারি দিক থেকে এমন সাবধানে চৌহদ্দী-বাঁধা যে তাকে মিলিয়ে নেওয়া কঠিন। তার চারি দিকের

৭১ পৃ ৬৫

সীমা-সরহদ্দ একেবারে পাকা গাঁথুনি দিয়ে গাঁথা। পাশাপাশি বাস করি অথচ মাঝখানে এমন দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিলের বাধা, এতে কখনও কারও সোয়াস্তি হয় না। পেটের মধ্যে খাদ্য আছে অথচ তা সমীকৃত হয়ে সমস্ত দেহের সঙ্গে মিলতে পারছে না এতে যেমন দেহের যন্ত্রণা, তেমনি ভারতের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই সাধনা পাশাপাশি রয়েছে অথচ তাদের মধ্যে সমন্বয়ের কোনো ভাব নেই, তাতে দেশেরও তেমনি একটা দুঃখ লেগেই ছিল।

এই বিপদটা বেশি হল পণ্ডিতদের মধ্যেই। পল্লীগ্রামে সাধারণ প্রাকৃত লোকেরা যে মুসলমান হয়েছেন তাদের মধ্যে পুরাতন সব সংস্কার রয়েই গিয়েছিল। এখনও দেখা যায় হুসেনী ব্রাহ্মণ, মালকানা রাজপুত, গুজরাতের পীরাণাপন্থী, বা কাকাপন্থী, মধ্যপ্রদেশের পীরজাদা বাংলাদেশের নট পটুয়া প্রভৃতি দল ঠিক হিন্দু কি মুসলমান বলা কঠিন।

এই সমন্বয়ের কাজটি শুরু করলেন মধ্যযুগে কবীর প্রভৃতি সাধকদের দল। অবশ্য কবীরের গুরু রামানন্দের নামই গোড়ায় করতে হয়। রামানন্দেরও পূর্বে প্রায় হাজার খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি মুনি রামসিংহের 'পাহুড দোহা'র মধ্যে কবীরের প্রায় সব বড়ো বড়ো সত্যই পাওয়া যায় তবু কবীরের সময়েই এই সমন্বয়ের একটি বড়ো চেষ্টা দেখতে পাই। কবীর মুখের বাক্যই বলেন নি, প্রচারের সঙ্গে তাঁর সবটা জীবনও যুক্ত ছিল। বৌদ্ধধর্মের শেষের দিকে নানা মলিনতা এসেছিল তবু একটা উদারতা ও ভক্তির ভাবও ক্রমশ দেখা দিচ্ছিল এবং সেইজন্যই তা প্রাকৃত মনের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। জৈনদের ধর্মের মধ্যেও 'পাহুড দোহা' প্রভৃতিতে সেই পরিণতিটাই দেখতে পাই। জৈনদের মধ্যে আরও পরে লুঙ্কাশাহপ্রবর্তিত মতে ঢুংঢিয়াস্থানকবাসীদের উপদেশে, তারণপন্থ প্রভৃতি মতে পৌত্তলিকতা বাহ্য অনুষ্ঠান প্রভৃতি পরিহার করার জন্য খুব জোর তাগিদ আছে। কিন্তু তারও বহু পূর্বে মুনি রামসিংহের 'পাহুড দোহা' প্রভৃতিতে এই-সব কথাই অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে দেখতে পাই।

'পাহুড দোহা'র রচয়িতা মুনি রামসিংহ ১০০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছির মানুষ। কারণ জৈনাচার্য হেমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন[৭২]।

---

৭২ Hiralal Jain, Pahuda Doha, Preface, p. 6

গুজরাতপতি সিদ্ধরাজের রাজত্বকালে (১০৯৬-১০৮৬ খ্রী) হেমচন্দ্র তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেন[৭৩]। সেই গ্রন্থে 'পাহুড দোহা' থেকে অনেক কিছু গৃহীত হয়েছে।

পাহুড দোহা

মুনি রামসিংহের পাহুড দোহাতে কবীরের মূল সত্য সবই ভালোভাবে দেওয়া আছে। তার একটু নমুনা পাহুড দোহা থেকেই দেওয়া যাক।

ভেখ বদলালে কী হবে, সাপ তো খোলস বদলায়, কিন্তু তার বিষটুকু ছাড়ে কি[৭৪]। মাথা মুড়িয়ে তো শিক্ষা নিলে, ধর্মের আশাও বাড়ল! কিন্তু সংসার ত্যাগ তবেই সার্থক হবে যবে ছাড়বে পরের ভরসা[৭৫]। তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে শুধু দেহ-দুঃখ[৭৬]। ওরে যোগী, যার জন্যে তুই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াস, সেই শিবস্বরূপও তো তোরই সঙ্গে সঙ্গে বেড়াচ্ছেন ঘুরে, তবু তুই পেলি না তাঁর নাগাল[৭৭]। মন যদি অশুদ্ধ থাকে তবে পুঁথি-পোথা পড়ে কি মোক্ষ হবে।

পোথা পঢ়নি মোক্‌খু কহঁ মণু বি অসুদ্ধউ জাসু ॥[৭৮]

জ্ঞানময় আত্মা ছাড়া আর-সব শাস্ত্র মিছে কল্পনা মাত্র[৭৯]। আখরে-লেখা কালিতে-আঁকা গ্রন্থ পড়ে পড়ে মরলি শুকিয়ে, আর কোথায় উদয় কোথায় অস্ত সেই সন্ধানই পেলি না জীবনে[৮০]। ভিতরে চিত্ত রইল মলিন, বাইরে তপ করে হবে কী[৮১]? ততদিনই বৃথা তীর্থাটন ও ধূর্তপনা যতদিন না গুরুর প্রসাদে দেহের মধ্যে দেবতার মেলে সন্ধান[৮২]। সাড়ে তিন হাত দেবালয়, সেখানে সন্ত নিরঞ্জনের বাস, নির্মল হয়ে সেখানে কর্‌ সন্ধান[৮৩]। যেখানে সন্ত শিবের অধিষ্ঠান সেই আপন দেহের করলি না সন্ধান[৮৪]। দেহ-দেবালয়ে আছেন শিব, তুই খুঁজে বেড়াস এই-সব দেবালয়ে, মনের মধ্যে আসে হাসি, সিদ্ধকে তুই বৃথা বানালি ভিখারি[৮৫]।

---

৭৩ Ibid , p. 29

৭৪ দোহা ১৫ ৭৫ দোহা ১৫৩ ৭৬ দোহা ১৭৮

৭৭ দোহা ১৭৯ ৭৮ দোহা ১৪৬ ৭৯ দোহা ১৯৯

৮০ দোহা ১৭৩ ৮১ দোহা ৬১ ৮২ দোহা ৮০

৮৩ দোহা ৯৪ ৮৪ দোহা ১৮০ ৮৫ দোহা ১৮৬

দেহ দেবলি সিউ বসই তুহু দেবলই ণিএহি।
হাসউ মহু মণি অথি ইহু সিদ্ধে ভিক্‌খ ভমেলি।— দোহা ১৮৩

আসলে জীবনে যদি সিদ্ধিলাভ চাই তবে চিত্তের নির্মলতা না হলে তা মিলবে না।

সিদ্ধত্তণু পরি পাবিয়ই চিত্তহ নিম্মল এণ।— দোহা ৮৮

চিত্ত নির্মল হলেই চিত্তের মধ্যে দয়ার উদয় হয়। আর দয়া বিনা কখনই ধর্ম হতে পারে না।

দয়া বিহীন উ ধম্মতা নাণির কহঁ বি ন জোই।— দোহা ১৪৭

দয়া কথাটাও ঠিক নয়। কেউই তো পর নয়। তাই আপনাকে যেমন প্রেম করি সর্বজীবে সেই রকম প্রেম করা চাই। ঝগড়া হবে কার সঙ্গে। যেখানেই দেখি সেইখানেই দেখি আপন আত্মাকে।

…কলহ কেন সম্মানউ
জহিঁ জহিঁ জোবউ তহিঁ অপ্পাণউ॥— দোহা ১৩৯

বুদ্ধদেবের মৈত্রীভাবনাতে এই কথাই অন্যভাবে প্রকাশিত। সে কথা পরে হবে।

পাহুড় দোহা বলেন, আগে পিছে দশ দিকে যে দিকে তাকাই শুধু তাঁকেই দেখি। তাই আমার সব ভ্রান্তি গেছে মিটে। আর কাকেও কিছু শুধাবার নেই।

অগ্গই পচ্ছই দহদিহহি জহিঁ জোবউ তহিঁ সোই।
তা মহু ফিট্টিয় ভংতড়ী অবসু ণ পুচ্ছই কোই॥— দোহা ১৭৫

শূন্য মনে হলেও ত্রিভুবনে কোথাও শূন্য বলে কিছু নেই। চর্মচক্ষে দেখায় বটে শূন্য। কিন্তু অন্তর দিয়ে দেখলে দেখা যায় শূন্যও শূন্য নয়।

সুণ্ণং ন হোই সুণ্ণং দীসই সুণ্ণং চ তিহুবণে সুণ্ণং॥— দোহা ২১২

আমার আত্মাই যদি সর্বত্র ব্যাপ্ত তবে কাকেই বা ঘৃণ্য অস্পৃশ্য বলে করি ত্যাগ, কাকেই বা করি পূজা, কারই বা করি সমাধি।

কাসু সমাহি করউ কো অংচউ
ছোপু অছোপু ভণিবি কো বচউ॥— দোহা ১৩৯

জলের মধ্যে লবণের মতো আপনাকে এমন করে সর্বব্যাপীর মধ্যে উপলব্ধি করাই হল সমরস হওয়া।

সমরসি হূবই জীবডা।—দোহা ১৭৬

তাঁর মধ্যেই তো নিরন্তর আছি তবু কেন সমরস-সিদ্ধি হয় না। পাহুড দোহা বলেন, শুধু একস্থান-স্থিতিতেই সিদ্ধি হবে না। এক ভাবে ভাবিত হতে হবে[৮৬]। আমি সগুণ, প্রিয় যে নির্গুণ, তিনি নির্লক্ষণ নিঃসঙ্গ। তাই একাঙ্গ হয়ে থাকলেও অঙ্গে অঙ্গে নিবিড় মিলনটি আর হয় না।

হউঁ সগুণী পিউ নিগ্গুণউ নিল্লক্খণু ণীসংগু।
একহিঁ অংগি বসংতযহঁ মিলিউ ণ অংগহি অংগু॥—দোহা ১০০

সেই আপনার মধ্যে আপনাকে পাওয়াই হল নির্বাণ লাভ।

অপ্পেঁ অপ্পা ঝাইযইঁ নিব্বাণং পউ দেহ॥—দোহা ১৭৮

পরমাত্মাকে "প্রিয়" বলে এই তো সম্বোধন এখানে দেখা গেল। তবেই, শুধু ভাগবত মতের ভক্তদের মধ্যেই এই প্রেমভাব দেখা গেছে এমন তো নয়। জৈন সাধকেরাও এই রকম ভক্তি ও প্রেমে ভরপুর হয়ে তাঁকে প্রিয়তম বলেছেন। জৈন সাধক আনন্দঘন তো সেই প্রেমভাবে ভরপুর, তাঁর কথা অন্যত্র বলেছি বলে এখানে আর তা বলব না। আর তিনি কবীরের পরবর্তী কালের অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। পাহুড দোহা কবীরের (পঞ্চদশ শতাব্দীর) পাঁচ শত বছর পূর্বেকার হয়েও সেই প্রেমেই মশগুল। বৈষ্ণবদের মত এরাও সখীভাবে সম্বোধন করেছেন।

হলি সহি কাইঁ করইঁ সো দপপণু।—দোহা ১২২
হল সহি কলহ কেন সম্মাণউ॥—দোহা ১৩৯

বৌদ্ধদের বাণীর মধ্যেও এই সখীভাবে সম্বোধন করার প্রথা দেখতে পাই[৮৭]। তার পর সর্ববিশ্বে মৈত্রীভাবনার কথা তো তাঁদের ধর্মের প্রাণ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ভারতের সাধনার মধ্যযুগের সব সম্পদ্ বহুকাল থেকেই চলে আসছিল। মুসলমান-সাধনা এই দেশে এলে সাধকেরা আবার নূতন করে সেই-সব মহান আদর্শকে সকলের সম্মুখে ধরলেন।

---

৮৬ দোহা ১৭৬

৮৭ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দোহাকোষ, পৃ. ৩২

বড়ো লোকের বাড়িতে অনেক পুরাতন বহুমূল্য জিনিস যত্নে তোলা থাকে। অতিথিবিশেষের আগমনে সেগুলিকে সকলের সামনে বের করা হয়। ভারতে যখন নতুন সাধনা ও সাধকের দল এলেন তখন সেই-সব মহান্ আদর্শকে আবার সকলের সামনে ধরতে হল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আগমনে রামমোহন সেই কারণেই উপনিষৎ প্রভৃতি থেকে পুরাতন সব সত্য নতুন করে উপস্থিত করলেন।

এই-সব পুরাতন সত্যকে রামমোহন তো নতুন করে রচনা করেন নি, তাদের শুধু পুনরুজ্জীবিত করলেন। যা ঘুমিয়ে ছিল তাকে জাগিয়ে তুললেন। সাধারণ লোকে সেই-সব মহাসত্য এমন করে ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁরাও অনেকে মনে করলেন রামমোহনই বুঝি এই-সব শাস্ত্র তাঁর স্বপক্ষের দলিল হিসাবে নিজেই রচনা করলেন। তাই তাঁর প্রচারিত উপনিষৎ মহানির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি সব শাস্ত্র অনেকে মনে করলেন রামমোহনেরই সৃষ্টি। কিন্তু সে-সব যে কত আগেকার তা পরে সবাই জেনেছেন।

সাধকের দল কিন্তু সেই-সব প্রাচীন মহাসত্যের খবর জানতেন। তাই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি সাধকেরা রামমোহনের এই-সব শাস্ত্রপ্রচারের উদ্যোগকে উৎসাহ দিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে দেখা হবার পর ভারতীয় সাধকেরা পুরাতন বেদ উপনিষৎ বেদান্ত দর্শন রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি সব শাস্ত্রগ্রন্থ নতুন করে দেখতে প্রবৃত্ত হলেন। সেইজন্যই রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের ধারা চলল। দয়ানন্দ শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতিকে নিয়ে আর্যসমাজের সাধনা চলল। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতির আলো দেশে ছড়িয়ে গেল, দক্ষিণের নারায়ণগুরু রমণ মহর্ষি প্রভৃতি সাধকের দল উঠলেন, রবীন্দ্র অরবিন্দ প্রভৃতি সাধকের বাণীও ছড়াতে লাগল। সনাতনপন্থীরাও তাঁদের উদ্যোগকে নূতন করে জাগালেন। পশ্চিমে রাধাস্বামীসম্প্রদায়, কাশীতে ভাস্করানন্দ বিশুদ্ধানন্দ, বৃন্দাবনে সন্তদাস, হরিদ্বারে ভোলানন্দ প্রভৃতির তপস্যা নতুন করে জাগল।

বৌদ্ধ দোহা

সেই-সব জাগরণের মধ্যে দেখা গেল পুরাতনই আবার এই যুগের ধাক্কা খেয়ে নতুন করে জাগল, নানা শাস্ত্রের খোঁজ শুরু হল। বৌদ্ধ মহাযান-সাধকদের যে-সব উপদেশ অপভ্রংশ ভাষায় রয়েছে তার প্রতি প্রথম মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তার পর দোহাকোষ বের হয়েছে। এই মনোযোগ আকর্ষণ শুধু কেতাবী পণ্ডিতদের জন্য। সাধকরা আগে হতেই এই-সব সত্যের খবর রাখতেন।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সম্পাদিত 'দোহাকোষ' সহজ দিয়েই আরম্ভ। সহজের পরই সমরস[৮৮]। "খসম" অর্থাৎ আকাশবৎ শূন্য চিত্তের কথাও তারই পরে[৮৯]। গুরুর কৃপায় এই-সব মর্ম বুঝতে পারা যায়[৯০]। এই সবই তো কবীর প্রভৃতির সঙ্গে হুবহু মেলে। কাজেই সহজ, সমরস, অসীমের আনন্দ প্রভৃতি তত্ত্ব কবীরেরই সৃষ্টি নয়। তীর্থ আশ্রম ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই-সবই দোহাকোষের মতে ব্যর্থ[৯১]। সহজের মধ্যেই পরমানন্দের মর্ম[৯২]। পরমার্থ হল গুণদোষাতীত, তা স্বসংবেদগম্য[৯৩]। মনকে মেরে নির্মূল করতে হবে[৯৪]। সরহপাদ বলেন, সহজ ছাড়া নির্বাণ নেই[৯৫]। কায়াসাধনই করতে হবে[৯৬]। ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নেই[৯৭]। যেখানে মন পবনের সঞ্চার নেই, রবি শশীর প্রবেশ নেই, সেই অন্তরতম লোকেই চিত্তের বিশ্রাম[৯৮]। পরম-মহাসুখ আদি-মধ্য-অন্ত্য প্রভৃতির অতীত, আর তার মধ্যে আত্মপরভেদের স্থান নেই[৯৯]। বদ্ধ মন ধায় চৌদিকে, মুক্ত হলে রয় মন নিশ্চল হয়ে[১০০]। চঞ্চল মনকে স্থির করাই হল সাধনার সব-চেয়ে বড়ো কথা। মধ্যযুগেরও বৌদ্ধদোহার সাধকেরা এখানে একমত।

---

৮৮ দোহাকোষ, ১ পৃ. ১-২ ৮৯ ঐ ১ পৃ. ৫ ৯০ ঐ ১, ৮

৯১ দোহাকোষ, ২ পৃ. ১৯, পৃ ৩, ২০ ৯২ ঐ পৃ ৩, ২৭ ৯৩ ঐ ৩, ২৯

৯৪ ঐ ৪, ৩৩ ৯৫ ঐ ১০, ১৩ ৯৬ ঐ ১০, ৯

৯৭ ঐ, ১১, ১৪ ৯৮ ঐ ১২, ২৫ ৯৯ ঐ ১৩, ১৭

১০০ ঐ ১৫, ৪৩

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গঙ্গা সাঅরু।
এথু পআগ বাণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু॥ ১৫, ৪৭

এই দেহের মধ্যেই গঙ্গা যমুনা এখানেই গঙ্গাসাগরসংগম, এখানেই প্রয়াগ বারানসী, এখানেই চন্দ্র দিবাকর— এ তো হুবহু কবীরের কথা। তাঁর "যা ঘট ভীতর সপ্ত সমূংদর" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ঘরে রইল তত্ত্ব বাহিরে মরি পুছে' পুছে' ১০১। অজরামরের কথাও ১০২ কবীরের মত। তাই শরীরের মধ্যেই দেহাতীতের গুপ্তলীলা।

অসরির কোই সরীরহি লুক্কো—২১, ৮৯

মধ্যযুগের সমস্ত তত্ত্বের সার কথা এইটুকু বৌদ্ধ বাণীর মধ্যে সুরক্ষিত।

সরহপাদের—"ঘরেও থেকো না বনেও যেয়ো না" "ঘরহি ন থক্কু ম জাহি বণে" ১০২ক প্রভৃতি বাণীতে বুঝি কবীরের "না ঘর রহা না বন গয়া" প্রভৃতি বাণী।

শূন্য ভরুর কথাও১০৩ মধ্যযুগে নানাভাবেই পাই। সরহের মতে ধর্মের সার কথা— পর-উপকার১০৪ অর্থাৎ মৈত্রীর সাধনা।

কাণ্হপাদ বলেন, আগম বেদপুরাণ সবই বৃথা১০৫। নিষ্কলুষ নিস্তরঙ্গ হল সহজের রূপ, তার মধ্যে পাপপুণ্যের প্রবেশ নেই১০৬। সেই সহজই একমাত্র পরম তত্ত্ব, আর-সব বেদশাস্ত্র মূর্খতার বিড়ম্বনা১০৭। সহজে মন নিশ্চল করে যে সমরস সিদ্ধি করেছে সে-ই তো সিদ্ধ, তার জরামরণ দূর হয়েছে১০৮।

সরহপাদ বলেন, করুণা ও শূন্য এই দুই সাধনাই যুক্ত করে সিদ্ধি লাভ করতে হবে১০৯। চন্দ্র সূর্য ধারা যুক্ত করতে পারলে পাপ-পুণ্য যায় ঘুচে, শরীর হয় অজরামর১১০।

শূন্য নিরঞ্জন হলেন পরম মহাসুখ, সেখানে না আছে পাপ না আছে পুণ্য।

---

১০১ দোহাকোষ, ১৭, ৬২
১০২ ঐ ১৮, ৬৯ — ১০২ক ২২, ১০৩
১০৩ ঐ ২৩, ১০৮-১০৯ — ১০৪ ঐ ২৩, ১১২ — ১০৫ ঐ ২৪, ২
১০৬ ঐ ২৫, ১০ — ১০৭ ঐ ২৫, ১২ — ১০৮ ঐ ২৫, ১৯
১০৯ ঐ ২৯, IV — ১১০ ঐ ৩০ VII

সুন্ন নিরঞ্জন পরম মহাসুহ তহি পুন ন পাব—৩৭, ১, ৪

এই দোহাকোষের টীকাতেও অনেক কথার সন্ধান মেলে। টীকাধৃত লোকায়ত মতে দেখা যায় যাগযজ্ঞ দানকর্ম শ্রমণব্রাহ্মণপরলোক কিছুই নেই।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ তাবন্ মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥—পৃ. ৬৬

ঠিক নাস্তিকতার ভাবে এই কথা সকলে বলেন নি। যাঁরা দেহ-দুঃখকেই ধর্ম মনে ক'রে অভাবাত্মক বৈরাগ্যকেই বড়ো তত্ত্ব বলেছেন, তাঁদের ভ্রম দেখাবার জন্য এই-সব কথা রবীন্দ্রনাথও তো বলেছেন—"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"। মধ্যযুগেও সুরদাসের কাছে শুনলাম "বৈরাগ যোগ কঠিন উধো হম ন করব হো"।

বিরাগের প্রতি দোহাকোষেরও মহাক্রোধ। আদিবুদ্ধ বলেন, বিরাগ হতে আর পাপ নেই, সুখ হতে আর পুণ্য নেই। বিরাগ নাস্তিধর্মাত্মক, সুখ ও আনন্দ হল অস্তিধর্মাত্মক।

বিরাগাৎ ন পরং পাপং ন পুণ্যং সুখতঃ পরম্।[১১১]

সুখই সব—

সুখং কৃষ্ণং সুখং পীতং সুখং রক্তং সুখং সিতম্।
সুখং নীলং সুখং কৃষ্ণং সুখং সর্বং চরাচরম্ ॥১১২

মধ্যযুগের মতে সাধনা বাইরে নয়, কায়ারই মধ্যে সারসাধনা হল কায়া-সাধন। কায়ার মধ্যে ইড়া-পিঙ্গলা-যোগ ষট্‌কমল-বেধ প্রভৃতি বড়ো কথা। অর্থাৎ ধর্ম বাহ্যাচার নয়, ধর্ম হল আপনারই মধ্যে সাধনীয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' দেখি, গঙ্গা যমুনার মাঝে বহে নাড়ী[১১৩]। শূন্যের সঙ্গে যখন শূন্য হয় মিলিত তখনই হয় সকল ধর্মের ফলোদয়।

সুনে সুন মিলিআ জবে।
সকল ধাম উইআ তবেঁ ॥—পৃ. ৬৭, ৪৪

ব্রাহ্মণ-শাসিতরা দেব-উপাসক বলে খ্যাত, আর বৌদ্ধমতের পরবর্তী ধর্মবাদের উপাসকেরা ছিলেন ধর্ম-উপাসক বলে পরিচিত। নেপালে বলে

---

১১১ দোহাকোষ, ১২৬ ১১২ ঐ ১১৩ চর্যাচর্যবিনিশ্চিয়, পৃ. ২৬, ১৪

দেভাজু, গুরুভাজু অর্থাৎ গুরুমতবাদী দল। তাই 'ন দেবায় ন ধর্মায়' কথার মধ্যে দুইটি ধারারই পরিচয় পাওয়া যায়। খুব প্রাচীন কালেও ব্রাহ্মণ ও ভাগবতদের দুই ধারা ছিল। সভাতে দুই দলকে সম্মানের আসন দেওয়া হত এই কথা বলে—"এই দিকে ব্রাহ্মণেরা আর এই দিকে ভাগবতেরা বসবেন"—"ইত ইতো ব্রাহ্মণা ইত ইতো ভাগবতাঃ।" ব্রাহ্মণ-শ্রমণ কথাতেও তার একটু ইঙ্গিত আছে।

দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধ ও জৈন সাধকদের মধ্যেও মধ্যযুগীয় বড়ো বড়ো তত্ত্ব ও আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তখনকার সাধনার আকাশ নৈতিক নানা মলিনতায় পূর্ণ হলেও সেই-সব তত্ত্বাণীর মধ্যে যে-সব মহাবার্তা রয়েছে তার আদর এই জগতে কখনো কমতে পারে না। এই-সব সম্পদের কথা অনেকদিন সাধারণের মধ্যে তত আলোচিত হয় নি। একেবারে হয় নি বলা চলে না। মরমী সাধকরা তার সন্ধান জানতেন। নাথ ও নিরঞ্জন -পন্থের মধ্যে, যোগীদের মধ্যেও বড়ো বড়ো সব তত্ত্বের আলোচনা ছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সম্পাদিত মূল পদগুলি অপভ্রংশ ভাষায় লেখা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই সব পদগুলি অষ্টম শতাব্দী থেকে রচিত হতে থাকে। প্রায় শ-চারেক বছর এইরূপ রচনা চলেছিল [১১৪]। দশম শতাব্দীতে মুনি রামসিংহের 'পাহুড় দোহা'তেও এই-সব মহাতত্ত্বের সন্ধানই পাই। কাজেই স্বাধীন বিচারে সবসম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার অতীত যে-সব মহাসত্য ছিল তার আলোচনা ভারতে যুগের পর যুগ চলে আসছিল। সাধকেরা তার সন্ধান জানতেন। মুসলমান সাধকেরা এলে ভারতের সাধকেরা এই তত্ত্ব তাঁদের দেখালেন। তখন হতে সাধারণ লোকদের মধ্যেও এই-সব তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া চলতে লাগল। জয়দেব, নামদেব, রামানন্দ প্রভৃতি এই কাজে প্রবৃত্ত হলেন। তার পর এলেন কবীর রবিদাস নানক প্রভৃতি মধ্যযুগের গুরুর দল।

---

১১৪ বৌদ্ধ গান ও দোহা, মুখবন্ধ পৃ. ৬

ভাগবতদের মত

তাই বলে অপভ্রংশ যুগেই এই-সব ভাব দেখা দিয়েছিল মনে করলেও ভুল করা হবে। এই যুগের পূর্বে ভাগবতদের যে যুগ তাতেও আমরা এই-সব সত্যের সন্ধান পাই। এই-সব ভাব ভাগবতের মধ্যেও রয়েছে দেখতে পাই। সেখানে এক ভগবানের উপাসনা, ভগবান ছাড়া আর কারও উপাসনায় নিজেকে জড়িয়ে না রাখা প্রভৃতি বড়ো বড়ো সত্যের প্রচার খুব জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে।

এই মতের প্রবল প্রবর্তক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধেরা যখন ইন্দ্রপূজার আয়োজন করলেন, তখন তরুণ শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, এই-সব বৈদিক দেবতাদের পূজার অর্থ কী। নন্দ বললেন, জলের দ্বারাই কৃষি, কৃষি বিনা অন্ন নেই। জল থেকে জীব বাঁচে। প্রাণীদের প্রাণই হল জল, এঁদের পূজায় সেই জলের উপায় হয়, বারিবর্ষণ হয়[১১৫]। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, প্রকৃতির কর্মের স্বভাবেই এই-সব সিদ্ধ হয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন (অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ) তিনিও প্রকৃতির ও জীবের কর্মানুসারেই ফল দিতে বাধ্য[১১৬]। প্রকৃতির স্বভাবেই মেঘ হয় এবং মেঘ সর্বত্র বারিবর্ষণ করে, তাতেই জীব বাঁচে। মহেন্দ্র আবার করবেন কী।

> রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বুনি সর্বতঃ।
> প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥—ভাগবত, ১০, ২৪, ২৩

তাই শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজা নিষিদ্ধ করলেন, দেবকোপ গোকুলের কোনো ক্ষতি করতে পারল না।

শ্রীকৃষ্ণের এই-সব কথা এখনকার দিনের কোনো বৈজ্ঞানিকের মুখেও বেমানান হয় না। ভাগবতেরা ভগবানকেই সার জেনে শাস্ত্রকে দিলেন গৌণ করে। কারণ, "সর্ববেদময়ো হরি", হরিই সর্ববেদময়[১১৬ক]।

বাহ্যশাস্ত্র প্রভৃতির উপর নির্ভর না করে আপনার অন্তরের আলোকের উপর নির্ভর করাই হল শ্রীকৃষ্ণের মত। গুরুর বিষয়েও শ্রীকৃষ্ণ বললেন আপনিই

---

১১৫ ভাগবত, ১০, ২৪, ৮ ১১৬ ঐ ১০, ২৪, ১৪ ১১৬ক ঐ ৭, ১১, ৭

আমার গুরু, "আত্মনো গুরুরাত্মৈব"[১১৭]। এই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের মতো স্বাধীন-মতবাদী এখনকার দিনেও দুর্লভ।

ভগবানের আরাধনায় সবারই অধিকার এই কথা ভাগবত খুব জোরের সহিত প্রচার করলেন— কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ পুক্কস্, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস— ভগবানের শরণে শুদ্ধ হন।

> কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দপুক্কসা
> আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।—ভাগবত, ২, ৪, ১৮

তাই অসুর মানুষ প্রভৃতি সব জীবদের সঙ্গেই ভাগবতেরা ভগবানকে শরণ করেন[১১৮]।

ভাগবতেরা ধর্মে সকলেরই সমান অধিকার স্বীকার করেছেন। ধর্মব্যবস্থা ছাড়া সমাজ ও অর্থনীতিগত ব্যবস্থাতেও ভাগবতেরা খুব উদার। অন্নাদির বিভাগ-ব্যবস্থাতে ভাগবতদের সমদৃষ্টি সকল যুগের পক্ষেই প্রশংসনীয়। সর্বজীবে যথাযোগ্য ভাবে অন্নাদির সংবিভাগও ধর্ম।

> অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ ॥—ঐ, ৭, ১১, ১০

ভাগবতদের মতে সকলেই ক্ষুধার ও প্রয়োজনের অনুরূপ অন্ন পেতে পারে। তার বেশি যে ছলে-বলে অধিকার করে সে চোর, সামাজিক ভাবে সে দণ্ডার্হ। এ-সব কথা তো এখনকার যুগের।

> যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্বং হি দেহিনাম্।
> অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥—ঐ, ৭, ২৪, ৮

শৈব ধর্মের মধ্যেও এই-সব কথাই পাই। বসব ছিলেন ব্রাহ্মণ, তিনিই লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের আদি গুরু। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব ১১০০ খ্রীস্টাব্দের পরই। তাঁদের মধ্যেও পুরাতন বহু ব্যর্থ আচার নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বসব-পুরাণ তার সাক্ষী। এঁরা জাতিভেদ, শাস্ত্রবন্ধন, প্রভৃতি অনেক কিছু মানেন না। ভক্তি ও শরণাগতিই এঁদের মতে বড়ো কথা। আর তারও পূর্বে অভিনবগুপ্তপাদ প্রভৃতিরও এই মত। নকুলীশ পাশুপত প্রভৃতির মতেও

---

১১৭ ভাগবত, ঐ ১১, ৭, ২০

১১৮ ঐ ৮, ৫, ২২

দেখা যায় বাহ্যাচারকে ত্যাগ করে ভিতরের বস্তুকেই সার বলা হয়েছে। আর সামাজিক নানা কৃত্রিম ব্যবস্থাকে অমান্য করা হয়েছে। "মন্দিরে দেবতাকে বন্দী না করে আপন জীবনে তাঁকে বহন করো"— এই হল লিঙ্গায়েত মতের সার তত্ত্ব। বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতির সাধনা ভাগবতেরও পূর্বে। পরবর্তী শৈব ও বৈষ্ণব ভাগবতদের মধ্যেও বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতি মহাসাধকদের সাধনার প্রভাব এসে পড়েছে।

বুদ্ধদেবের মৈত্রী

বুদ্ধদেবের মৈত্রীভাবনা এক অপূর্ব বস্তু। তাকেই তিনি 'ব্রহ্মবিহার' বলেছেন।

মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবংপি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধোচ তিরিয়ঞ্চ অসংবাধং অবেরমসপত্তং॥
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥—সুত্তনিপাত, ১, ৮, ৭

"মাতা যথা প্রাণ দিয়াও আপন একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন এইরূপই সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণে প্রেমভাব জন্মাইবে, সর্বলোকের প্রতি অপরিমাণ মৈত্রীভাব জন্মাইবে। উর্ধ্বদিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে তাবৎ এই মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে, ইহাকেই বলা হয় ব্রহ্মবিহার[১১৯]।

আজ এই মৈত্রীভাব ও ব্রহ্মবিহারের কথা বৌদ্ধেরা ভুলে গেছেন; খ্রীস্টশিষ্যেরাও ভগবান খ্রীস্টের প্রেমের ধর্ম ভুলে গেছেন। আজকার রক্তাক্ত প্রপীড়িত পৃথিবীতে এই-সব মহা আদর্শ আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে

১১৯ হস্তসার, ২২৮

মানবসভ্যতা বেঁচে যাবে আর এই-সব মহাসত্যকে স্বীকার করতে না পারলে সব সভ্যতা ও সংস্কৃতি রসাতলে যেতে বাধ্য।

উপনিষৎ ও সংহিতা

বুদ্ধদেবও এই-সব সত্যের প্রথম দ্রষ্টা নন। বুদ্ধদেবের জীবনেও পূর্ববর্তী উপনিষদের সব সত্য মূর্তিমান হয়ে উঠেছিল। উপনিষদের মধ্যে একটা খুব বড়ো রকমের মুক্ত আবহাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধান উপনিষৎগুলির বড়ো বড়ো কথা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু অনেক উপনিষৎ আছে যা সাধুসন্ন্যাসীরাই ব্যবহার করেন, গৃহস্থদের মধ্যে তার বেশি প্রচলন নেই। সেগুলি হয়তো প্রধান প্রধান উপনিষৎগুলির অনেক পরে রচিত, কিন্তু তার মধ্যে যে-সব নির্ভীক সত্য রয়েছে তার সঙ্গে আর মধ্যযুগের কবীর রবিদাস প্রভৃতির বাণীর সঙ্গে বিশেষ কিছুই প্রভেদ নেই। F. Otto Schrader মাদ্রাজ Adyar Library থেকে যে "Minor Upanishads" গ্রন্থাবলী নামে সংন্যাস উপনিষদ প্রভৃতি বের করেছেন (1912), আর সেখান হতেই যে Unpublished Upanishads গ্রন্থাবলী প্রকাশিত (1933) হয়েছে সে-সব উপনিষদের মধ্যে থেকে থেকে কিছু উদ্ধৃত করে দেখানো যাক।

'শাট্যায়নীয়োপনিষৎ' বলছেন, মনই হল মানুষের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।—পৃ. ৩২১

কাজেই সাধকের পক্ষে মনকেই সাধতে হবে। এই কথাই কবীর প্রভৃতিরও সার কথা। বাহ্য আচারে বিচারে কী আর হবে, ভিতরের বস্তু যে মন, তাকেই আগে শুদ্ধ করা চাই। বাহিরের শিখা সূত্র আচার প্রভৃতি ব্যর্থ। পরব্রহ্মোপনিষৎ বলেন, যিনি মনকে সাধন করেছেন তাঁর অন্তরেই শিখা এবং উপবীত—

অথাস্য পুরুষস্যান্ত শিখোপবীতিত্বম্।—পৃ. ২৯৫

'ব্রহ্মোপনিষৎ' বলেন তাঁরা বাইরের শিখা সূত্র ত্যাগ করে, অক্ষর পরব্রহ্মকে সূত্রস্বরূপ ধারণ করবেন।

সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ ॥— পৃ. ৮৫

যাঁদের এই অন্তরস্থ জ্ঞানযজ্ঞোপবীত আছে তাঁরাই সূত্রবিৎ, তাঁরাই যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী।

সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্।
তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ ॥— পৃ. ৮৬

'নারদ পরিব্রাজকোপনিষতে' ১৫১-৫২ পৃষ্ঠায়ও এই কথাই আছে। 'পরব্রহ্মোপনিষৎ' বলে, ব্রাহ্মণ যদি মুক্তি চান তবে অন্তঃশিখোপবীত ধারণ করবেন।

ব্রাহ্মণস্য মুমুক্ষোরন্তঃশিখোপবীতধারণম্ ॥— পৃ. ২৯৩

যাঁর জ্ঞানময়ী শিখা এবং জ্ঞানময় উপবীত, তাঁরই পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য, অন্যদের কিছুই নেই।

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য নেতরেষাং তু কিংচন ॥— পৃ. ২৯৯

তাই যোগবিজ্ঞানতৎপর বিপ্র বহিঃসূত্র ত্যাগ করবেন।

বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বিপ্রো যোগবিজ্ঞানতৎপরঃ ॥— পৃ. ২৯৮

এইরূপে যে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করে যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া যায় জাবালোপনিষতে সেই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য অত্রিকে উপদেশ দিয়েছেন[১২০]।

যাঁর অদ্বৈত আত্মজ্ঞান হয়েছে তাঁর পক্ষে সেই জ্ঞানই যজ্ঞোপবীত। ধ্যাননিষ্ঠাই তাঁর শিখা। তাঁর কর্ম পবিত্র। তিনি সর্বকর্মান্বিত, তিনি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মনিষ্ঠাপর, তিনি দীপ্যমান ঋষিশ্রেষ্ঠ, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই জগদ্গুরু।

যস্যাত্ম্যদ্বৈতমাত্মজ্ঞানং তদেব যজ্ঞোপবীতম্। তস্য ধ্যাননিষ্ঠৈব শিখা। তৎকর্ম পবিত্রম্। স সর্বকর্মকৃৎ স ব্রাহ্মণঃ স ব্রহ্মনিষ্ঠাপরঃ স দেবঃ স ঋষিঃ স শ্রেষ্ঠঃ স এব সর্বজ্যেষ্ঠঃ এব স জগদ্গুরুঃ [১২১]।

তাঁরা জানেন যে মাথা মুড়িয়ে দণ্ড ধারণ করে বাহ্য বেশ ধারণ করলে বা দম্ভাচারে মুক্তি হয় না—

---

১২০ পৃ. ৬৭

১২১ পরমহংসপরিব্রাজকোপনিষৎ পৃ. ২৮৭

> ন দণ্ডধারণেন ন মুণ্ডেন
> ন বেষেণ ন দম্ভাচারেণ মুক্তিঃ ॥—নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ, পৃ. ১৮০

তাঁদের শাস্ত্রও তাঁদের জ্ঞানদীপ্ত অন্তরের মধ্যেই প্রাপ্ত। বাহিরের ঋক-যজু-সাম প্রভৃতি সবই তাঁদের কাছে ব্যর্থ। তাই 'ইতিহাসোপনিষৎ' বলেন, ঋগ্বেদ যদি জেনে থাক তবে না হয় দেবতাদের কথাই জেনেছ, যজুর্বেদ জেনে থাকলে বড়ো জোর যজ্ঞের কথাই না হয় জান, সামবেদ জানলে না হয় আর-সব জানলে, কিন্তু মানস বেদ যিনি জেনেছেন তিনিই ব্রহ্মকে জেনেছেন।

> ঋচো হ যো বেদ স বেদ দেবান্
> যজুংষি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্।
> সামানি যো বেদ স বেদ সর্বং
> যো মানসং বেদ স বেদ ব্রহ্ম ॥— পৃ. ১১

বর্ণাশ্রমও তাঁদের কাছে ব্যর্থ। 'মৈত্রেয় উপনিষৎ' বলেন বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত বিমূঢ়গণ কর্মানুসারে ফল পেয়ে থাকেন, আর বর্ণাদি ধর্ম ত্যাগ করে মানব স্বানন্দতৃপ্ত হতে পারেন।

> বর্ণাশ্রমাচারযুতা বিমূঢ়াঃ
> কর্মানুসারেণ ফলং লভন্তে।
> বর্ণাদি ধমং হি পরিত্যজন্তঃ
> স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি ॥— পৃ. ১১২

প্রতিমাদি বাহ্য পূজার বিষয়েও 'মৈত্রেয়োপনিষৎ' বলেন, পাষাণ, লৌহ, মণি, মৃন্ময় বিগ্রহের পূজায় বিড়ম্বিত মানুষের জন্ম ও ভোগ চলতেই থাকে, তাই সাধক মুক্তির জন্য বাহ্যার্চনা ছেড়ে আপনার হৃদয়ের মধ্যেই অর্চনা করবেন।

> পাষাণলোহমণিমৃন্ময়বিগ্রহেষু
> পূজা পুনর্জননভোগকরী মুমুক্ষোঃ।
> তস্মাদ্ যতিঃ স্বহৃদয়ার্চনমেব কুর্যাদ্
> বাহ্যার্চনং পরিহরেদপুনর্ভবায় ॥— পৃ. ১১৮

তাঁরা বাহ্য সন্ধ্যামন্ত্রেরও ধার ধারেন না। লোকে সেজন্য তাঁদের কাছে কৈফিয়ত চাইলে তাঁরা বলেন, জাতাশৌচে বা মৃতাশৌচে তো সন্ধ্যা করা চলে না। আর উদয়-অস্তকালেই সন্ধ্যা করতে হয়। আমাদের মোহরূপ মাতা

মরেছেন, বোধময় সুত জন্মেছে, জাত-মৃত দ্বিবিধ অশৌচ নিয়ে কী করে সন্ধ্যা করি।

মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সুতঃ
সূতকদ্বয়সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥— পৃ. ১১৫

তার পর সমুজ্জ্বল হৃদয়াকাশে চিন্ময় সূর্য সদাই উদ্ভাসিত, তার উদয়ও নেই অস্তও নেই, কী করে তবে সন্ধ্যা করি।

হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি।
নাস্তমেতি ন চোদেতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥— মৈত্রেয়োপনিষৎ, পৃ. ১১৬

কাজেই যথার্থ সাধকদের না আছে বাহ্য কোনো ভেখ (বেশ) না আছে বাহ্য কোনো আচার— তাঁরা অব্যক্তলিঙ্গাচার অর্থাৎ তাঁদের সবই অন্তরের মধ্যে।

অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারাঃ।— জাবালোপনিষৎ পৃ. ৬৯

বাহ্য সাধনা নেই বলে তাঁদের যে সাধনা নেই তা কিন্তু নয়। অন্তরের দেবালয়ের মধ্যে নিরন্তর তাঁদের সাধনা। দেহই তাঁদের দেবালয় আর জীব হয়েও তাঁরা শিব। মৈত্রেয়োপনিষৎ বলেন—

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।— পৃ. ১১৩

এই দেহ-দেবালয় নিয়েই মধ্যযুগের সন্তদের সাধনা। তাঁদের সাধনার প্রধান কথাই দেহের মধ্যের সাধনা নিয়ে।

তাঁদের আচারও অন্তরের আচার। অভেদদর্শনই তাঁদের জ্ঞান, নির্বিষয় মনই ধ্যান, মনকে নির্মল করাই স্নান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহই শৌচ।

অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ
স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।— পৃ, ১১৩

কাজেই দেখা যাচ্ছে এঁদের সাধনা নাস্তিধর্মাত্মক নয়। 'সামরহস্যোপনিষৎ' বলেন, প্রেমসাধনার দ্বারা স্বর্গ বা মুক্তি মিলবে যদি কেউ মনে করে থাকেন তবে ভুল করবেন, আসলে প্রীতির দ্বারা প্রীতিরই উদ্ভব হয়। ভক্তির দ্বারা ভক্তি হয়, স্নেহের দ্বারা স্নেহ উপজিত হয়। এই প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-সিদ্ধি কি স্বর্গ বা মুক্তির চেয়ে কিছু কম।

প্রীতিঃ প্রীত্যা ভবতি ভক্তির্ভক্ত্যা ভবতি স্নেহঃ স্নেহেন ভবতি।— পৃ. ২৮৮

তাই তাঁরা মুক্তভাবেই ভগবানকে নমস্কার জানিয়েছেন। সেই ভগবান নাস্তিধর্মাত্মক নন, তিনি আনন্দময়। তিনি ধর্ম, তাঁকে নমস্কার; সর্বধর্মাতিরিক্ত তাঁকে নমস্কার; অনন্তসুখসম্ভব তাঁকে নমস্কার।

নমো ধর্মায় নমঃ সর্বধর্মাতিরিক্তায়,···অনন্তসুখসম্ভবায় নমঃ।

—সামরহস্যোপনিষৎ পৃ. ২৪৭

'পরমাত্মিকোপনিষৎ' বলেন, বিশ্বময়ই নারায়ণ হরি, তিনি বিশ্বব্যাপী পরম নিত্য তাঁকে নমস্কার।

বিশ্বতঃ পরমনিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্।—পৃ. ১৩৮

এ-সব কথা পরবর্তী উপনিষদের। তাই যদি কেউ বলেন, এই-সব তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে পরবর্তী কালে, তাঁদের বলব এই "পরবর্তী কালও" আজকের কথা নয়। তার পর এই-সব তত্ত্ব বহু পুরাণে বেদসংহিতাতেও পাই। তার মধ্যে বৈদিক ও বেদপূর্ব ধারারও মিলন আছে। আসলে এই-সব জিনিস হাজার হাজার বছরের পুরানো।

সংহিতাগুলির মধ্যে 'ঋগ্বেদে'ও মধ্যযুগের মতো অনেক হেঁয়ালির দেখা পাই। দশম মণ্ডলে, ২৭ সূক্তের ঋক্ প্রভৃতি, ৫৫ নং ও ৮২ নং সূক্ত, ১২৫ সূক্তের ৭-৮ম প্রভৃতি ঋক্ দ্রষ্টব্য।

অমর দেবতাদেরও মেরে মানবকে অমরত্ব দানের কথা দেখতে পাই[১২২]। যিনি এই সৃষ্টির মূলে তাঁকে না বুঝতে পেরে মানুষ আপন কল্পনার মধ্যেই বৃথা বিচরণ করছে[১২৩]। কেই-বা এই তত্ত্ব জানে, কেই-বা তা বলতে পারে। হয়তো সৃষ্টিকর্তাই তা জানেন, অথবা তাও জানেন না[১২৪]। তাই দেবতার স্বরূপ নিয়েও তাঁদের এই প্রশ্ন, কাকে আমরা হবি দিতে পারি[১২৫]। তাই যাগযজ্ঞের অতীত প্রার্থনা দেখতে পাই—অন্ধকার দূর করো, চক্ষু আলোকে পূর্ণ করে দাও, পাশবদ্ধ আমাদের বন্ধনমুক্ত করো—

অপ ধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষু মুমুগ্ধি অস্মান্ নিধয়েব বদ্ধান্।—ঋগ্বেদ, ১০, ৭৩, ১১

১২২ ঋগ্বেদ, ১০, ১৩, ৪
১২৩ ঋগ্বেদ, ১০, ৮২, ৭
১২৪ ঋগ্বেদ, ১০, ১২৯, ৬-৭
১২৫ ঋগ্বেদ, ১০, ১২১ সূক্ত

'যজুর্বেদে'র মধ্যে যে শিবসংকল্প মন্ত্র তাকেও আমরা যাগযজ্ঞের কোঠার মধ্যে ফেলতে পারি নে। ভূত ভবিষ্যৎ সবই সেই অমৃতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, আমাদের মন কল্যাণসংকল্পে পূর্ণ হোক[১২৬]। তাঁর প্রতিমা নেই, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি"[১২৭]।

'সামবেদে'ও ঋকের মতোই সব কথা আছে। বাহুল্য ভয়ে বেশি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়।

বৈদিক ও অবৈদিক ধারার যুক্তবেণি

এই পৃথিবী ও প্রকৃতির উপাসনা তন্ত্রের মধ্যেও দেখি। তান্ত্রিকরা শক্তির উপাসক, সব শক্তির মূলে প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্য থেকেই আজও বৈজ্ঞানিকরা যত শক্তি আবিষ্কার করেছেন। কাজেই এখনকার বৈজ্ঞানিকদেরও শাক্ত বা তান্ত্রিক বলা চলে। প্রাচীনকালেও তান্ত্রিকদের মধ্যেই ছিল রসায়নশাস্ত্র। বেদ ও তন্ত্র আজ আমাদের ধর্মে যুক্ত ধারায় প্রবহমাণ।

ভারতের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রগ্রন্থ চরক-সুশ্রুতে সব ঔষধ গাছগাছড়া দিয়ে তৈরি। তাকে বলে কাষ্ঠাদি ভেষজ। নাগার্জুনের পর থেকে এল পারদ প্রভৃতি ধাতুগঠিত ঔষধ। তার নাম রসাদি ভেষজ। রস হল 'পারা'র নাম। নাগ প্রভৃতি জাতিদের মধ্যেই পারদ প্রভৃতির প্রচলন ছিল। পারদ শিববীর্য। শিব আর্যেতর জাতির দেবতা। নাগার্জুন হয়তো অনার্য নাগ এবং আর্যসংস্কৃতির সম্মেলন। অর্জুন অর্থ সাদা। নাগ কালো এবং শ্বেত আর্য এই দুয়ে মিলে নাগার্জুন।

বেদে ইক্ষু বা গুড় নেই। তাঁদের মিষ্টি জিনিস ছিল মধু। ভারতে এসে তাঁরা ইক্ষু পেলেন। পৌণ্ড্র দেশ ও জাতি আছে। ইক্ষুর নামও পৌণ্ড্র। বোধ হয় গুড়ের নামেই গৌড় দেশ। পৌণ্ড্রবর্ধনও বাংলাদেশের মধ্যে। আর্যরা ঘৃতই জানতেন, তিল ও তৈল এসে দেখলেন ভারতে। তাই তেলের চেয়ে ঘৃত পবিত্র।

---

১২৬ বাজসনেয়িসংহিতা, ৩৪, ৪

১২৭ ঐ, ৩২, ৩

ভাষাতত্ত্ববিদেরা দেখেছেন কর্পূর, কম্বল প্রভৃতি শব্দও বাইরের আমদানি। কার্পাসও তাই। ভারতে এসে আর্যেরা এই-সব জিনিস পেলেন। কার্পাসের সুতায় মিহি কাপড়ের জন্য হাজার হাজার বছর আগে থেকেই ভারতের খ্যাতি রয়েছে।

পান জিনিসটা বোধ হয় নাগদের কাছেই পাওয়া। তার নামই 'নাগবল্লী'। পান নারকেল সুপুরি প্রভৃতি আর্যেতর জাতির কাছে প্রাপ্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য বেদে নেই। আমের মতো এমন চমৎকার ফলও বেদে দেখা যায় না। কলাও বোধ হয় পরে পাওয়া। এই তো সেদিন য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয়ের পর আমরা তাদের আমদানি করা লঙ্কা, তামাক, মর্তমান কলা, পেয়ারা, লিচু, আনারস, লোকাট, পেঁপে, আলু, কপি, বিলিতি কুমড়ো প্রভৃতি ফল ও তরকারি পেলাম। এখনো অনেক প্রাচীন মন্দিরে এ-সব ফল ও তরকারি চলে না, অথচ, লঙ্কা না হলে এখন অতি নিষ্ঠাবতী বিধবারও বিপদ। তামাক না হলে তো আমরা একেবারে নিরুপায়। পণ্ডিত তা নাকে টানছেন, মেয়েরা তা দাঁতে দিচ্ছেন, বৃদ্ধেরা তা হুঁকোয় ফুঁকছেন, ছেলেরা চুরোটে টানছেন। চা-ও সেদিনের আমদানি, তারও ব্যাপ্তিটা সামান্য নয়। সনাতনপন্থী মান্দ্রাজ অঞ্চলেও কফির প্রচণ্ড প্রচলন। আফিম জিনিসটা মুসলমানেরা আনেন। 'অহিফেন' নামে তাকে আমরা সংস্কৃতে চালাবার চেষ্টা করেছি। আয়ুর্বেদে তা ছিল না, পরে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজপুতেরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতেও এই আফিম এবং অবরোধ প্রথাটি গ্রহণ করেছেন। এর নামই হল inferiority complex। ইংরেজেরা আবার এ দেশ থেকে আফিম নিয়ে জোর করে আমদানি করলেন চীনদেশে।

নেশার কথা যখন উঠল তখন এখানেই বলে দেওয়া উচিত যে আর্যেরা মদটি বেশ জানতেন। এখানে এসে পেলেন সিদ্ধি ও গাঁজা। শিবের উপাসকদের মধ্যে তার প্রচলন ছিল। আফিম-গুলি-চরস প্রভৃতি এল মুসলমানদের আসবার পরে। কাজেই পরস্পরের মিলনে ভালো মন্দ নানা জিনিসেরই লেন-দেন ঘটেছে। রোগের দিক দিয়েও কলেরা পূর্বদিক থেকে গেল পাশ্চাত্ত্য জগতে, উপদংশ বসন্ত প্রভৃতি রোগ এল সেখান থেকে এ দেশে। কে হারল কে জিতল, কে জানে।

একটা কথা এখানে বলা ভালো। হাসপাতাল জিনিসটা ভারতে খুব পুরানো। বৌদ্ধরা তার বিশেষ উৎকর্ষ করেছিলেন। রোগীর সেবককে তাঁরা বলতেন 'উপস্থায়ক'। ধৌলি গিরনার প্রভৃতি শিলাশাসনে দেখা যায় সম্রাট অশোকের আজ্ঞায় পশুচিকিৎসালয় সব স্থাপিত ছিল। পশু-চিকিৎসার হাসপাতালের কথা আমরা জৈনদের 'পুরাতনপ্রবন্ধ-সংগ্রহে'ও পাই। বস্তুপালের যুগে পশুচিকিৎসালয় ছিল। বাংলাদেশে কুচবিহারে চার-শ বছর আগে Ralph Fitch পশুহাসপাতাল দেখে গেছেন, তখন য়ুরোপেও তা অপরিজ্ঞাত। দক্ষিণ-ভারতের রুদ্রাম্মার মালকাপুর শিলাশাসনে (১২৬২ খ্রীঃ) দেখতে পাই সে দেশে বাঙালি গুরু শিবাচার্য তখনকার দিনে প্রসূতিশালা অর্থাৎ মেয়েদের হাসপাতাল করে দিয়েছিলেন।

লিপি কথাটার প্রসঙ্গে বলতে পারা যায় যে লিপিবিদ্যা ভারতে অতি প্রাচীন বিদ্যা। মোহেঞ্জোদরতে লিপি পাওয়া গেছে। কাজেই তা বাইরের কাছে পাওয়া বিদ্যা নয়। বেদপন্থীরা কিন্তু লিপির পক্ষপাতী ছিলেন না। বেদ শুনে শিখতে হত। বেদ লেখায় নরকবাস বিধান।

বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামনঃ।

লিখবার প্রাচীন মালমসলা ছিল ভূর্জপত্র, তালপাতা প্রভৃতি। রাজার আজ্ঞা লেখা হত শিলায় বা তামার পাতে। চীনদেশ হতে কাগজ এল ভারতে, আনলেন মুসলমানরা। এখনো কাগজীরা সব মুসলমান।

বেদপন্থীরা প্রতিমাপূজা করতেন না। তাঁরা এ দেশে এসে তা পেলেন। প্রতিমাপূজায় যাঁদের আপত্তি তাঁরা শিল্প হিসাবে প্রতিমাকে আদর করেছেন। চিত্রাদিও সেই সঙ্গে আদৃত হয়েছে। আর্যদের পবিত্র হল অগ্নি, আর্যেতরদের পবিত্র হল শিলা, এখন শুভকর্মে শিলা ও অগ্নি দুইই লাগে। বৃক্ষাদি পূজা, বিশেষ বিশেষ পশু পূজা, তীর্থাদির পবিত্রতাও সেইখান হতেই পাওয়া। বিষ্ণুভক্তেরা তুলসী, শিবভক্তেরা বিল্ব পূজা করছেন। তোড়াদের মধ্যে গোমহিষ ছাড়া দেবতা নেই। উপবাস ব্রত প্রভৃতিও বোধ হয় বেদবাহ্য। বৈদিক আর্যেরা দেহকে কষ্ট দিয়ে ধর্মসাধনা করতে চাইতেন না।

নানা সংস্কৃতির তুলনা করতে গিয়ে এ দেশে হেতুবাদ অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনাদি খুব উৎকর্ষ লাভ করেছে। হেতুবাদের সঙ্গেই আসে শব্দশাস্ত্র। নানা

ভাষার তুলনায় ভারতে ব্যাকরণশাস্ত্রও উন্নতি লাভ করেছে। Philology-র আদিগুরু ভারতীয় শব্দশাস্ত্রবিদ্‌রা। ভারতে প্রান্তভাগের লোকেরাই নানা ভাষার তুলনা করে ব্যাকরণ রচনা করতে পেরেছেন। পাণিনি যাস্ক প্রভৃতি ব্যাকরণকারেরা যেখানকার লোক তাকে এখন 'কাবুল' বলে। তাঁদের সন্তানেরাই হয়তো এখন এ দেশে হিং বেচতে আসেন।

ভারতে গ্রাম্য পঞ্চায়েত সভাসমিতির দ্বারা সমাজ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি প্রথাও বোধ হয় আর্যদের পূর্বেই ছিল। লিচ্ছবি বৃজি বৈশালীতে এবং সন্ন্যাসীদের মঠে লোকেরা নির্বাচন প্রথায় ভোট দিয়ে শাসনকার্য চালাতেন। মুসলমান রাজারাও এই পঞ্চায়েত শাসন নষ্ট করেন নি। রাজার অদলবদল হলেও গ্রাম্য ব্যবস্থা ঠিকই থাকত। এই পঞ্চায়েত প্রথা ইংরেজ আমলে নষ্ট হয়েছে। এখন রাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ায় অতি প্রাচীন একটা প্রথা ক্রমে ক্রমে প্রাণহীন হয়ে পড়েছে।

ভারতের অন্য সব প্রদেশে রাজারা ভূমি দান করে যে তাম্রশাসন দিয়েছেন তাতে প্রজাদের লিখেছেন—"বিদিতমস্তু ভবতাম্‌" অর্থাৎ এঁকে যে জমি দিলাম তা তোমাদের জানা হোক্‌। বাংলার তাম্রশাসনে দেখা যায় "মতমস্তু ভবতাম্‌"— অর্থাৎ এঁকে যে ভূমি দিচ্ছি তাতে তোমাদের মত চাই। কাজেই বোধ হয় বাংলাদেশে প্রজাদেরই অধিকার ছিল ভূমিতে, রাজাদের নয়।

আর্যদের মধ্যে ক্রমে পুরোহিত-তন্ত্র ধর্মশাসনের ব্যবস্থা হল। মধ্যযুগে তা থেকে একটা মুক্তির চেষ্টা দেখা যায় সাধুসন্ন্যাসীদের সাধনার মধ্যে। সে সাধনাও নতুন নয়। তাঁদেরও একটি স্বতন্ত্র শাসনধারা শাস্ত্রশাসিত ধারার পাশে পাশে চলে আসছে। যাগযজ্ঞের অতীত কথা, অনন্তের রহস্য, মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম, বাহ্য রীতিনীতির অতীত ধর্মের কথা,— ভারতের সাধনার ধারার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে। সেই ধারার মধ্যে আর্য সাধনা আর্যপূর্ব সাধনা, আর্যেতর সাধনা, নানা সাধনার ধারাই এসে মিলেছে। 'অথর্ববেদে' যে এত সম্পদ তার কারণ অথর্বের যুগে আর্য সভ্যতার সঙ্গে আর্যপূর্ব এবং আর্যেতর নানা সভ্যতার ভরপুর মিলনটি ঘটেছিল। সেই কারণেই উপনিষদের যুগে সাধনার এত বৈচিত্র্য এবং গভীরতা। যখন গ্রীকসভ্যতা ও মধ্য এশিয়া হতে আগত

সব সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশের পরিচয় হল তখন ভাগবতেরাই সব সম্পদ্ দিয়ে সেই মিলনের উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর করলেন।

দ্রবিড় সভ্যতা তো কম দিনের নয়। অনেকে মনে করেন দ্রবিড় সভ্যতা আর্যদের সভ্যতা থেকেও পুরাতন। তাঁদের মধ্যে যে চিরদিনই ভক্তিধর্মের প্রভাব ছিল সে কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। বেদেও ভক্তির কথা না আছে তা নয়, তবে দ্রবিড় ভক্তদের ভক্তির মহত্ত্বের তুলনা নেই। হয়তো বৈদিক যুগেও এই দ্রবিড়দের ভক্তিই বৈদিক আর্যদেরও প্রভাবান্বিত করে তুলেছিল। ঋগ্বেদের সময়েও বৈদিক আর্যদের সভ্যতার সঙ্গে দ্রবিড় সভ্যতার যে প্রগাঢ় পরিচয় ঘটেছে তা দেখাই যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টীয় সাধকেরা যখন দক্ষিণ-ভারতে এলেন তখন খ্রীষ্টীয়দের সঙ্গে মিলন ঘটাবার যে কাজে বৈদিক যাগযজ্ঞ কিছুই করতে পারল না, সেই কাজ করল দ্রবিড়দের উদার ভক্তি ও প্রেম। আল্‌বার ভক্তেরা তাই নিয়েই সাধনার মিলনের উৎসব-ভূমিটি রচনা করলেন।

ভারতে মুসলমান সাধনা

মুসলমান রাজ্যজয়ের পূর্বেও যে-সব মুসলমান সাধক ভারতবর্ষে এসেছেন তাঁরাও এ দেশে ভূবৃত্তি প্রভৃতি নানা সৎকারে অভ্যর্থিত হয়েছেন। কখনো কখনো এই-সব ফকিররা পরবর্তী কালে দেশজয়ার্থ আগত মুসলমান যোদ্ধাদের সহায়তাও করেছেন, যেমন "মনের" প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু তাতেও ভারতের উদার আতিথ্যধর্ম কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। সাধকেরা থাকবেন সাংসারিক লাভালাভ বিচারের উপরে উর্ধ্বলোকে।

ভারতের আদি সূফী সাধক হলেন মখদুম সৈয়দ আলি অল্ হুজবেরী। লাহোরে ভাটি দরবাজার কাছে তাঁর সমাধিস্থান। সমাধিমন্দির-দ্বারে লেখা আছে সমাধির কাল ১০৭২ সাল। হুজবেরী ছিলেন গজনী প্রদেশের লোক। তিনি নানা দেশ পর্যটন করে লাহোরের এক অংশে এসে বাস করলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কশ্‌ফ্ অল্ মহজুব' সাধনাশাস্ত্রের একটি অমূল্য রত্ন। গুরুর কাছে সাধনালাভের গুপ্ত সব পথ এই গ্রন্থে প্রকাশিত

করা হয়েছে। তাঁর সমাধিস্থল হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সম্মানিত। আজমেরে মৈনুদ্দীন চিশতীর সমাধিস্থানও ঠিক তাই। সেখানে গান-বাদ্যের ছড়াছড়ি। ভক্তিতে প্রেমে সেই তীর্থ ভরপুর। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ বা শুষ্ক বাহ্যাচার হতে সেখানকার পবিত্র তীর্থ অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত।

কিন্তু তবু হিন্দু মুসলমানের মিলনটি পণ্ডিতদের দ্বারা সাধিত হল না। কারণ কি মুসলমান মুল্লা-কাজি কি হিন্দু পণ্ডিত-পুরোহিত সবাই আপন আপন শাস্ত্রের ও ধর্মের সীমানা সামলাতেই ব্যস্ত। নদীর দুই কূল। যদি কেউ আপন কূল ছেড়ে একটু না এগিয়ে আসে তবে সেতু রচিত হবে কেমন করে। পণ্ডিতদের দল তো কেউ নিজ নিজ কোট ছাড়বেন না। কাজেই এই সেতু রচনার ভার নিলেন সব সহজ সাধকের দল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর দীন দরিদ্র নীচকুলজাত। দুই-একজন পণ্ডিত এবং অভিজাত যদিও এই দলে এসে পড়লেন, তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কুল ও জ্ঞানের সব অভিমান ভাসিয়ে দিলেন।

ভারতে মুসলমান সাধকদের বাদশা হলেন খাজা মৈনুদ্দীন চিশতী। তাঁর জন্ম ১১৪২ খ্রীস্টাব্দে। ১১৯৩ সালে তিনি ছিলেন দিল্লীতে। ১২৩৩ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। ফরীদ উদ্দীন শকরগংজ মৈনুদ্দীনের শিষ্য। তাঁর দেহাবসান ঘটে ১২৬৫ সালে, তাঁর শিষ্য নিজামুদ্দীন ঔলিয়ার জন্ম ১২৩৮ সালে বদাউন নগরে। সলীম চিশ্তী তো আকবরের সময়কার। স্থরবর্দী শাখার মহাসাধক বাহাউদ্দীন জাকারিয়ার জন্ম মূলতানে, মৃত্যু ১২৬৬ সালে। সাধক মখদুম জাহানিয়া তাঁর নাতি। তাঁর নাতি বরহানুদ্দীন কুতব-ই-আলা গুজরাতে গিয়ে বাস করেন এবং ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে বটাবাতে দেহত্যাগ করেন। কাদিরী শাখার সাধক সৈয়দ মুহম্মদ উছনগরে ১৫১৭ সালে দেহত্যাগ করেন। সাহ জলাল ১২৪৪ সালে ইহলোক হতে বিদায় নেন। এই-সব সাধকদের অনেকেই কবীরের পূর্ববর্তী।

সংস্কৃত ছিল হিন্দুদের দেবভাষা। মুসলমানদের সেই বাঁধন না থাকায় তাঁদের সময়ে বাংলা হিন্দী প্রভৃতি চলিত ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা অতিশয় সমৃদ্ধ হয়েছে। মুসলমান রাজারা এই বিষয়ে প্রভূত সহায়তা করেছেন।

ভারতীয় সংগীতে ও স্থাপত্য চিত্রাদি নানাবিধ কলায়ও মুসলমানের দান

কম নয়। তাঁরা পেয়েছেন এবং দিয়েছেন দুইই। মোটের উপর ভারতীয় মুসলমানদের কলাবিদ্যা ও সংগীতশাস্ত্র অন্য দেশের মুসলমানদের কলা ও সংগীত-শাস্ত্র থেকে অনেক বিশদ ঐশ্বর্যযুক্ত এবং স্বতন্ত্র।

বাহ্য আচার ও ভাবভক্তি

বৈষ্ণবেরা বললেন, "পরকে মান দিয়ো কিন্তু নিজে মান চেয়ো না। ভেদবুদ্ধি ছাড়ো। ভগবানকে শুধু কথার কথা করে রেখো না, সংসারে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করো।" শৈবভক্ত জঙ্গমসম্প্রদায়-প্রবর্তক বসব বললেন, "জাতির অহংকার ছাড়ো, দেবতার নাম শুধু মুখে উচ্চারণ করে লাভ নেই, তাঁকে জীবনের মধ্যে বহন করো। প্রত্যেক জঙ্গম দেবালয় হও।" কিন্তু কিছুকাল যেতে না যেতেই বৈষ্ণবরাও তাঁদের মহা আদর্শ ভুললেন ; সংসারে ভগবানকে প্রতিষ্ঠার স্থলে প্রতি সংসারে ঠাকুরঘর তৈরি হল, ঠাকুর তাতে বন্দী রইলেন, বাকি সংসারে ঠাকুরের আর প্রবেশ নেই! জঙ্গমরাও প্রত্যেকে গলায় এক-একটি শিবলিঙ্গ ঝুলিয়ে রেখে, জীবনে ভগবানকে বহন করবার হুকুম তামিল করলেন।

এমন দুর্গতির দিনে মধ্যযুগে ভারতে নামদেব রামানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তের উদয় হল। বাহ্য আচারব্যবহার যে ব্যর্থ তা সকলকে বুঝিয়ে দিতে তাঁরা উদ্যত হলেন। এই বাহ্য আচারই হিন্দুমুসলমানের মিলনের যত বাধা। অন্তরের ভক্তি প্রেমে তো সবাই মিলতে পারেন। রামানন্দ বললেন, কোথায় যাও বাইরে। ঘরেই তো উৎসব লেগেছে।

কত জাইঐ রে ঘর লাগু রংগু।—গ্রন্থ সাহেব, বসন্ত রাগ, পৃ. ৬০৩

ভগবানকে পূজার জন্য মন হল ব্যাকুল, চন্দন চুয়া সুগন্ধ নিয়ে ব্রহ্মভবনে চললাম পূজা করতে। গুরু বললেন, সেই ব্রহ্ম যে তোর মনেরই মধ্যে। বাইরে যেখানেই যাবি সেখানে তীর্থ নামে শুধু জল, আর মূর্তি নামে শুধু পাষাণ।

এক দিবস মন ভই উমংগ।
ঘসি চংদন চোআ বহু সুগংধ
পূজন চালী ব্রহ্ম ঠাই।
সো ব্রহ্ম্ বতাইও গুর মনহী মাহি ॥
জহা জাইঐ তঁহ জল পখানা।—ঐ

বেদে-পুরাণে বৃথা খুঁজে মরা। যদি অন্তরের মধ্যে তাঁকে না পাওয়া যেত তবে না হয় সেই ব্যর্থ শ্রম করার কোনো অর্থ থাকত :

বেদ পুরাণ সভ দেখে জোই।
উহাঁ তউ জাই ঐ জউ ঈহাঁ ন হোই ॥—ঐ

এই যে রামানন্দের মুখে এই-সব মহাবাণী দেখা গেল তাতে এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে তিনিই এই কথাগুলির স্রষ্টা। এই ভাবগুলি দীর্ঘকাল ধরেই দেশের মধ্যে জাগ্রত ছিল, তার পর তা লুপ্ত হয়েও দেশের হৃদয়ে চাপা রইল। তাই যখন রামানন্দ তা উচ্চারণ করলেন তাতে সারা দেশ সাড়া দিল।

ভাগবতেরা বলেন যাঁরা অন্যমনা হয়ে ভজনা করেন তাঁরাই ভক্ত[১২৮]। আর্যেতর কিরাত হূণ অন্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশ আভীর শুহ্ম যবন খস প্রভৃতি জাতিও এই ভক্তির দ্বারা ধন্য ও কৃতার্থ হবার অধিকারী[১২৯]। মগধের আচারহীন কীকটেরাও এই ভগবদ্ভক্তির দ্বারা ধন্য হন[১৩০]। এই-সব বাণী অতি প্রাচীন, তবে লোকে ভুলে গিয়েছিল, পরে তা আবার প্রচারিত হল[১৩১]।

দৈত্যকুলজ প্রহ্লাদ নিষ্কাম ভক্তির বিষয়ে চমৎকার বলেছেন। তাঁর মতে ভক্তির মধ্যে কিছু ফলাকাঙ্ক্ষা থাকলে ভক্তিরই অপমান[১৩২]। ধ্রুবও শ্রদ্ধা ভক্তির কথা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন[১৩৩]।

গীতায় তো ভক্তির কথা চমৎকার ভাবেই বিবৃত হয়েছে[১৩৪]। 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে'ও ভক্তির কথা বলা হয়েছে[১৩৫]।

---

১২৮ ভাগবত, ১১, ১১, ৩৩ ১২৯ ভাগবত, ২, ৪, ১৮
১৩০ ঐ ৭, ১০, ১৯ ১৩১ ঐ ১১, ১৪, ৩
১৩২ ঐ ৭, ১০ম অধ্যায় ১৩৩ ঐ, ৪, ৯ম অধ্যায়
১৩৪ গীতা, ৯, ২৯ ; ১১, ৫৪ ; ১৪, ২৬ ; ১৮, ৫৫ ইত্যাদি ১৩৫ ৬, ২৩

মহাভারতে শান্তিপর্বে দেখা যায় ভক্তির প্রসঙ্গ[১৩৬]। ভক্তদের কথাও সেখানে আছে[১৩৭]। শান্তিপর্বে ৫১তম অধ্যায়ে ভগবৎপ্রপন্ন উত্তম ভক্তের সৌভাগ্য [১৩৮] এবং কথা আছে। অভক্তের কাছে ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন না[১৩৯]। ভক্ত বলেই ভীষ্ম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন[১৪০]। গ্রিয়ার্সন প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, বৈদিক যুগে ক্ষত্রিয় সাধকেরা শ্রদ্ধাভক্তির সাধনা করেছেন[১৪১]। সেই-সব রাজসাধকদের মধ্যে জনক, প্রবহণ-জৈবলি, অশ্বপতি-কৈকেয়, অজাতশত্রু প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদে সপ্তম মণ্ডলে বশিষ্ঠের যে-সব স্তব বরুণ দেবতার উদ্দেশে রচিত সেগুলি ভক্তির রসে অভিষিক্ত। বিষ্ণু বা ব্যাপকশীল দেবতাকে ভক্ত ঋষি স্তব করে বলেছেন, তিনি বন্ধু, তাঁর চরণে মধুর উৎস[১৪২]। তবে এ কথা সত্য বৈদিককাল থেকে যতই পরবর্তী যুগে যাওয়া যায় ততই প্রেমভক্তির কথা বেশি। আর্যপূর্ব সভ্যতার সঙ্গে যোগের সেই ফল। সেই ফলও খ্রীস্ট জন্মাবার বহুপূর্বে ভারতের সাধনায় দেখা গিয়েছে।

ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলে[১৪৩] "ভক্তম্ অভক্তম্" আছে, সেখানে সায়ন অর্থ করেছেন "সেবমানম্ অসেবমানম্"। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে[১৪৪] "ভক্তয়ে" কথার সায়ন অর্থ করেন 'সংভজনায়'। কিন্তু বৈষ্ণবজনোচিত ভক্তির ভাব এতে নেই। ঋগ্বেদে "শ্রদ্ধা ইং তে মঘবন্"[১৪৫]আছে। ইন্দ্র শ্রদ্ধায় আনন্দিত[১৪৬]। সোমকে বলা হয়েছে, ঋতবাক্যে সত্যে শ্রদ্ধায় তপস্যায়[১৪৭] তুমি বহমান হও। "শ্রদ্ধাং বদন্"[১৪৮] কথাও পাই। দশম মণ্ডলে "শ্রদ্ধামনস্যা" কথার অর্থ সায়ন করেছেন "শ্রদ্ধাযুক্তয়া মনস ইচ্ছয়া" শ্রদ্ধাযুক্ত মনের ইচ্ছায়[১৪৯]। ঋগ্বেদের

---

১৩৬ শান্তি ৪৭, ১০১
১৩৭ ঐ, ৪৭, ৯৭
১৩৮ ঐ ৫১, ৯
১৩৯ ঐ ৫১, ১১
১৪০ ঐ ৫১, ১২-১৩
১৪১ J. R. A. S. 1908, 843
১৪২ ঋগ্বেদ ১, ১৫৪, ৫
১৪৩ ঋগ্বেদ, ১, ১২৭, ৫
১৪৪ ঐ, ২৭, ১১
১৪৫ ঐ, ৭, ৩২, ১৪
১৪৬ ত্বং শ্রদ্ধাভির্মন্দসানঃ ঋগ্বেদ ৬, ২৬, ৬
১৪৭ ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা, ঋগ্বেদ ৯, ১১৩, ২
১৪৮ ঐ ৯, ১১৩, ৪
১৪৯ ঐ ১০, ১১৩, ৯

দশম মণ্ডলে ১৫১ সূক্তটির দেবতাই শ্রদ্ধা। আগাগোড়া এই সূক্তে শ্রদ্ধারই কথা। শ্রদ্ধায় অগ্নি সমিদ্ধ হয়, শ্রদ্ধায় হবি আহুতি দেওয়া হয়। সকলে আরাধ্যের প্রধানভূতা শ্রদ্ধাকে আমরা স্তব করি :

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।
শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি বচসা বেদয়ামসি ॥—ঋগ্বেদ, ১০, ১৫১, ১

হৃদয়ের ব্যাকুলতায় এই শ্রদ্ধালাভ করা যায়—"শ্রদ্ধাং হৃদয্যয়াকূত্যা"[১৫০]। শ্রদ্ধাকেই প্রাতঃকালে সন্ধ্যায় আহুতি দিই, মধ্যাহ্নে শ্রদ্ধাকেই আহুতি দান করি, সূর্যের অস্তগমনবেলায় শ্রদ্ধাকেই আবাহন করি, হে শ্রদ্ধে, আমাদের শ্রদ্ধাযুক্ত করো।

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যংদিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ ॥—ঋগ্বেদ ১, ১৫১, ৫

ঋগ্বেদ হতে অথর্বে গেলে বৈদিক যুগের আদি-অন্ত ধরা হবে। সেখানে দেখি যজ্ঞের দুই চক্ষু হল সত্য ও ঋত; বিশ্ব সত্য, ও শ্রদ্ধা তার প্রাণ[১৫১]। মানবের নিগূঢ় সম্পদ তার শ্রদ্ধা[১৫২]। ব্রত শ্রদ্ধা ও সত্য বিশ্বরচনার মধ্যে অপূর্ব রহস্য[১৫৩]। আরও বহু স্থলে শ্রদ্ধার কথা আছে। কিন্তু আর উদ্ধৃত করে লাভ নেই।

বিশুদ্ধ কর্মকাণ্ডে ভক্তিশ্রদ্ধার তেমন স্থান নেই। বৈদিক আর্যেরা কর্মকাণ্ড-প্রধান; তাই পূর্বমীমাংসাতে কর্মেরই স্থান, ভক্তির মুখ্য স্থান নেই। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য দেখলে বোঝা যায় ক্রমেই আর্যেতর সভ্যতার ভক্তি ও প্রেম প্রভৃতি দিনে দিনে আর্যদের মধ্যে প্রবেশ করছিল। পুরাণে ও ভাগবতের যুগে কর্মকাণ্ড গৌণ হয়ে শ্রদ্ধাই প্রধান হল।

ভাগবত ও বৈদিক যুগের কথা ছেড়ে মধ্যযুগে যদি আসি তখনও জৈন বৌদ্ধ সাধনার অবশেষ ও পাহুড দোহা প্রভৃতিতে ভক্তির কথা বেশ দেখতে পাই। তার পর এল রামানন্দের প্রবর্তিত মহাযুগ।

---

১৫০ ঐ ১০, ১৫১, ৪
১৫১ অথর্ববেদ, ৯, ৫, ২১
১৫২ অথর্ব, ১০, ২, ১৯
১৫৩ অথর্ব, ১০, ৭, ১; ১০, ৭, ১১

রামানন্দ-ধারায় সমদৃষ্টি

রামানন্দ নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পূর্বসম্প্রদায়ও ছিল আচারনিষ্ঠ রামানুজ-প্রবর্তিত পন্থ। কিন্তু নিজে ভারমুক্ত হয়ে বের হলেন রামানন্দ। মুক্তপুরুষ রামানন্দ বাহ্য আচার ছাড়লেন। তিনি সংস্কৃত ছাড়লেন, সংস্কৃত ছেড়ে চলতি ভাষায় উপদেশ দিলেন। এতদিন সাধনা প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তিনি সকলকেই সাধনা দিলেন। তাঁর প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে রবিদাস ছিলেন মুচি, কবীর ছিলেন জোলা, সেনা ছিলেন নাপিত, ধন্না ছিলেন জাঠ, পীপা ছিলেন রাজপুত। আচারের ধর্ম ছেড়ে ভক্তির ধর্মই রামানন্দ করতে লাগলেন প্রচার। পূর্বেই বলা হয়েছে এই ভক্তি দ্রবিড় দেশ থেকে রামানন্দ উত্তর-ভারতে আনলেন। আর সেই ধর্ম ভালো করে ছড়িয়ে দিলেন কবীর।

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীর নে সপ্তদ্বীপ নৌ খণ্ড।

এই ভক্তির ধর্মপ্রচারে নামদেব ও সদনার নামও উল্লেখযোগ্য। আদি নামদেব ছিলেন দরজী। কাপড়ে ছাপ-দেওয়া নামদেব পরবর্তী যুগের ভক্ত। সদনা ছিলেন কসাঈ। কবীরের ধারাতেই দাদূ, রজ্জব, সুন্দরদাস প্রভৃতির স্থান। তার মধ্যে সুন্দরদাসই অবতীর্ণ বৈশ্যকুলে। আর মুসলমানবংশপ্রভব দাদূ রজ্জব প্রভৃতির জন্ম তুলা-ধুনকরের কুলে, যদিও সে কথা পরে চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ভক্তের জাতিকুলের পরিচয়ে কী হবে। ভক্তিই তাঁদের যথার্থ পরিচয়। উত্তর ভারতের মহাগুরু হলেন কবীর। পরবর্তী সব সন্ত-মতই অল্পাধিক ভাবে কবীরের মতবাদের দ্বারাই প্রভাবিত।

হিন্দু মুসলমান উভয়কে মেলাবার চেষ্টাই ছিল কবীরের প্রধান ব্রত— খোদা যদি মস্‌জিদেই বাস করেন তবে আর-সব মুলুক কাঁর। তীর্থে মূর্তিতে রামের বাস, এই দ্বৈত ভাবের মধ্যে সত্য কোথায়। হায় পূর্বদিকে হরির বাস, আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম। আরে খুঁজে দেখো হৃদয়ের মধ্যে, সেখানেই রাম রহিমান।

জোর কুদাই মসীত বশত হৈঁ ঔর মুলিক কিসকেরা।
তীরথ মূরতি রাম নিবাসা দুহুঁ মৈ কিনহুঁ ন হেরা ॥
পূরিব দিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মুকামা।
দিল হী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ইঁহা রাম রহিমানা ॥
—কবীর গ্রন্থাবলী, নাগরী প্রচারিণী, পৃ. ১৭৬

হিন্দু মরে রাম রাম করে, মুসলমান মরে খোদা খোদা করে, এই-সব ভেদ-বুদ্ধির মধ্যে যে না পড়ল সেই তো বাঁচল।

হিন্দু মুয়ে রাম কহি মুসলমান খুদাই
কহৈ কবীর সো জীবতা দুহ মৈঁ কদে ন জাই ॥—ঐ, পৃ. ৫৪

রাজপুতানাতে ১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দে দাদূ জন্ম গ্রহণ করেন। এখন তাঁর বহু ভক্ত ভারতে নানা স্থানে আছেন। তিনি বলেন, সব ঘটে একই আত্মা :

সব ঘট একৈ আত্মা ক্যা হিন্দু মুসলমান ॥
—চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী, স্বামী দাদূদয়ালকী বাণী, পৃ. ৩২৩

আল্লা রামের ভ্রম আমার ছুটেছে, হিন্দু তুরুক কোনো ভেদই নেই :

অলহ রাম ছুটা ভ্রম মোরা
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহি ॥—ঐ, পৃ. ৩৮৪

সাম্প্রদায়িক ভেদরহিত যে পথ তাই হল পূর্ণ পথ।

দ্বৈ পথ রহিত পংথ গহি পূরা—চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠি, দাদূ, পৃ. ৩৮৩

তুমিই অলখ ইলাহী, তুমিই রাম রহীম।

অলখ ইলাহী এক তূ তূহী রাম রহীম ॥—ঐ, পৃ. ৪৫৫

হিন্দু বলে আমার পথই পথ, মুসলমান বলে আমার পথই সাচ্চা।

হিন্দু মারগ কহৈঁ হমারা তুরক কহৈ রাহ মেরী ॥—ঐ, পৃ. ১৯২

সকল পথই যে ভগবানেই গিয়ে মিলেছে সে কথা বার বার বললেন মধ্যযুগের সাধকের দল। দাদূ বললেন, ব্রহ্মকে এমন করে খণ্ড খণ্ড করে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নিয়েছে ভাগ করে, পূর্ণব্রহ্মকে ছেড়ে সবাই বদ্ধ হল ভ্রমের গাঁঠে।

খংড খংড করি ব্রহ্মকৌ পখি পখি লিয়া বাঁটি
দাদূ পূরণ ব্রহ্ম তজি বঁধে ভরম কী গাঁঠি।—ঐ, ১৯২

দাদূর মতে, এই দুইই ভ্রম, হিন্দু মুসলমান এই সব ভেদবুদ্ধি গ্রাম্যতা।

দাদূ দুনূঁ ভরম হৈ হিন্দু তুরক গবাঁর ॥—ঐ, পৃ. ২০২

চাই আল্লাই বল, চাই রামই বল, সবই শাখা-আশ্রয় করা। তার চেয়ে ডাল ছেড়ে সবাই মূলকে আশ্রয় করো।

অলহ কহৌ ভাবৈ রাম কহৌ
ডাল তজো সব মূল গহৌ ॥—ঐ, পৃ. ৫২৩

সকলে যে বলেন সম্প্রদায়ে না থাকলে কাজ করা যায় না, কিন্তু ধরিত্রী-আকাশ জলবায়ু দিনরাত্রি, চন্দ্রসূর্য এঁরা তো দয়াময়ের সবচেয়ে বড়ো সেবক। এঁরা কার দলে। অলখ ইলাহী জগদ্‌গুরু ছাড়া আর তো কেউ এদের মালিক নেই।

দাদূ যে সব কিসকে পংথমে ধরতী অরু অসমান।
পানী পবন দিন রাতি কা চংদ সূর রহিমান ॥
যে সব কিসকে হৈব রহে যহু মেরে মন মাঁহি।
অলখ ইলাহী জগতগুর দূজা কোঈ নাহি ॥—ঐ, পৃ. ২০০-২০১

সম্প্রদায়ভেদ সত্ত্বেও মানবের মধ্যে যে এই অভেদদর্শন এটা মধ্যযুগের একটা মস্ত কথা। যে জাতিভেদ এখন ভারতের প্রধান সমস্যা সেই জাতিগত ভেদ তা তাঁরা স্বীকার করেন নি। কবীরপন্থের সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হল "বীজক"। তার ৬২ নং বীজকে দেখা যায়— যদি ভগবান বর্ণ-বিচারই করেন তবে জন্ম হতেই একই ভাবে সবাই কেন ত্রিতাপদহনে দগ্ধ। জন্মকালে সবাই শূদ্র, মরণেও শূদ্র, মাঝখানে মায়াময় জগতে কৃত্রিম পৈতা ধারণ করে বৃথা অহংকার করা মাত্র। যদি তুমি ব্রাহ্মণীর ছেলে ব্রাহ্মণ, তবে কেন অন্য কোনো শুদ্ধ পথে জগতে এলে না। আর যদি তুমি তুরুকনীর (মুসলমান নারীর) গর্ভে হয়েছ বলেই তুরুক, তবে পেটে থাকতেই কেন সুন্নত না করিয়ে এখানে এলে। কালো গাই বা হলদে গাই, দুয়েরই দুধ একই বর্ণ, সেই দুই দুধের ভিন্নতা করতে পার? ওরে অতি-সেয়ানা মানুষ, সব ছল ছাড়ো, কবীর বলেন, ভগবানকে ভজনা করো।

জো তূ করতা বরণ-বিচারা।
জন্মত তীনি ডংড অনুসারা ॥

জন্মত শূদ্র মূয়ে পুনি শূদ্রা।
ক্রিতিম-জনেউ ঘালি জগ ধুংদ্রা॥
জো তুম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণি জায়ে।
আবর রাহতে কাহে ন আয়ে॥
জো তুম তুরুক তুরুকনী জায়ে।
পেটহিঁ কাহে ন সুনতি করায়ে।
কারী পিয়রী দুহউ গাঈ।
তাকের দুধ দেহু বিলগাঈ।
ছাড় কপট নর অধিক-সয়ানী।
কহহিঁ কবীর ভজু সারংগ-পানী॥—বীজক, রমৈনী, দং ৬২

বোঝা যাচ্ছে কবীরের সময়েও "অধিক-সয়ানী" অতিবিজ্ঞের দল কম ছিলেন না। কবীর তাঁদের চিনতেন, যোগ্য নামেই তাঁদের সম্বোধন করতেন।

কবীর আরও বলেছেন, গুপ্ত প্রকট একই চিহ্নে তো সবাই চিহ্নিত, তবে কাকে বা বল ব্রাহ্মণ আর কাকেই বা বল শূদ্র। ঝুটা গর্বে কেউ ভুলে থেকো না। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সব ভেদবুদ্ধিই শুধু মিছে ভ্রান্তি।

গুপ্ত প্রকট হৈ একৈ মুদ্রা।
কাকো কহিয়ে ব্রাহ্মণ শুদ্রা॥
ঝূঠ গর্ব্ব ভুলো মতি কোঈ।
হিন্দু তুরুক ঝূঠ কুল হোঈ॥
—মৎসম্পাদিত কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫

জাতিভেদ সম্প্রদায়ভেদ স্ত্রীপুরুষভেদ এ-সব কিছুই অধ্যাত্মজগতে টেকে না, কবীর তাই বলেন, বেদ-কোরাণে সংসারে ধর্মভেদ নিয়ে এ-সব কী মিছে গোলমেলে কথা। কে বা পুরুষ কে বা নারী। একই বিন্দু একই মলমূত্র এক চাম এক ইন্দ্রিয় এক জ্যোতি থেকেই সবাই উৎপন্ন, তবে কে বা ব্রাহ্মণ আর কে বা শূদ্র।

ঐসো ভেদ বিগূর্চন ভারী
বেদ কতেব দীন অরু দুনিয়া কৌন পুরিখ কৌন নারী।
একৈ বুংদ একৈ মলমূতর এক চাম এক গূদা।
এক জোতি থৈ সব উতপনা কৌন ব্রাহ্মণ কৌন সূদা।
—কবীর গ্রন্থাবলী, নাগরী প্রচারিণী, ঐ ১০৬

কবীর নিজেও ছিলেন জোলা, তা তিনি সগর্বে স্বীকার করেছেন। কাজেই ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার কবীর মানতেন না—ওহে পাঁড়ে (ব্রাহ্মণ), কী বৃথা কর ছোত (ছোঁয়াছুঁয়ি) বিচার! ছোঁয়াছুয়ি হতেই তো সব সংসার উৎপন্ন। তোমাতে আমাতে রক্তে দুগ্ধে কোনো ভেদ আছে কি। তবে তুমি বা কিসে ব্রাহ্মণ আর আমি বা কিসে শূদ্র। ছুত ছুত করেই যদি জন্মালে তবে অশুচি গর্ভবাসের পথে কেন বা এলে তুমি। জন্মাতেও ছোত, মরণেও ছোত, কবীর বলেন নির্মল হল হরির জ্যোতি।

কাহে কৌ কীজৈ পাংডে ছোতি বিচারা।
ছোতীহীঁ তৈ উপনা সব সংসারা॥
হমারৈ কৈসে লোহূ তুমহারে কৈসে দূধ।
তুমহঁ কৈসে ব্রাহ্মণ পাংডে হম কৈসে সুদ।
ছোতি ছোতি করতা তুমহীঁ জায়ে।
তৌ প্রভবাস কাহেঁ কোঁ আয়ে॥
জনমত ছোত মরত হী ছোতি।
কহৈ কবীর হরিকি নৃমল জোতি॥—ঐ, পৃ. ১০১ নীচের পাঠ

কবীরের ছয় পুরুষ পরে ভক্ত দাদূ (১৫৪৪ খ্রীঃ) এই-সব কথা আরও সোজা ভাষায় বলে গেলেন—আল্লা রাম সব ভ্রমই এখন আমার ছুটেছে। হিন্দু-মুসলমানে নেই কোনো ভেদ, সর্বত্র এখন তোমার লীলাই দেখি। সেই একই প্রাণ, সেই একই দেহ, সেই একই রক্তমাংস, সেই একই নয়ন নাসিকা, সেই কানে একই রকম শব্দ বাজে, জিহ্বায় লাগে মিষ্টরস, সেই একই ক্ষুধায় সবাই ব্যাকুল, এক ভাবেই সবাই জাগে, একই সবার সন্ধি, একই সবার বন্ধ, একই সবার সুখদুঃখ। সবার একই হস্তপদ একই শরীর— কী যে তামাশা তাতেও এত ভেদ।

অলহ রাম ছুটা ভ্রম মোরা
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহী
দেখোঁ দর্সন তোরা।
সোই প্রাণ পাংড পুনি সোঈ, সোঈ লোহি মাসা।
সোঈ নৈন নাসিকা সোঈ, সহজৈ কীনহ তমাসা।
শ্রবণৌ সবদ বাজতা সুনিয়েঁ, জিভ্যা মীঠা লাগৈ।
সোঈ ভুখ সবন কৌ ব্যাপৈ, এক যুগতি সোই জাগৈ।

সোঈ সংধি বংধ পুনি সোঈ, সোই সুখ সোঈ পীরা।
সোঈ হস্ত পাব পুনি সোঈ, সোঈ এক সরীরা।

—চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী, দাদূ, পৃ. ৩৮৩

এক ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অভাবেই সমভাবে সবাই ব্যাকুল এই কথা বলে এই যুগে সাম্যবাদ প্রচারিত হয়েছে রাশিয়ায়। আর তখন কবীর-দাদূ প্রভৃতি সাধকেরা এই কথা বলেই ভগবানের সঙ্গে সবার সমান সম্বন্ধ দেখিয়েই সর্বমানবের সমতার কথা প্রচার করে গেছেন।

প্রাচীন যুগের সমদৃষ্টি

সমতার এই-সব কথাই আমরা বসবকৃত বীরশৈবদের বসবপুরাণে ও 'পাহুড দোহা' প্রভৃতি গ্রন্থে পাই। সরহপাদের 'দোহাকোষে'ও প্রথমেই এই কথা[১৫৪]। সরহপাদ বলেন, "ব্রাহ্মণ এই রহস্য জানে না।" এর সংস্কৃত ভাষাতে লেখা টীকাতে দেখি যে জাতি-ব্রাহ্মণ কথাই টেকে না। টীকাকার বলেন, সংস্কারে জাতি হয় যদি বলা যায় তবে সবারই সংস্কার হতে পারে, তাই জাতি সিদ্ধ হয় না "তস্মাৎ ন সিধ্যতি জাতিঃ"[১৫৫]। দোহাকোষ ৭ পৃষ্ঠায় ৪৬ নং দোহার টীকায় দেখা যায়, শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বলে বিশেষ বিশেষ জাতি কিছু নেই। সবাই এক জাতি এই সহজ ভাব—"তয়া ন শূদ্রং ব্রাহ্মণাদিজাতিবিশেষং ভবতি সিদ্ধং। সর্বে লোকা একজাতি-নিবদ্ধাশ্চ সহজমেবেতি ভাবঃ"[১৫৬]।

দোহাকোষের টীকাতে যে-সব কথা দেখেছি ভবিষ্যপুরাণে সেই-সব কথাই আরও জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। ভবিষ্যপুরাণ বলেন, যখন সামগ্রী ও অনুষ্ঠানগুণে শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণদের সমান অর্থাৎ কোনো দিকেই কম নয় তখন ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ আধ্যাত্মিক বা বাহ্যনিমিত্তক কোনো কারণেই সিদ্ধ হয় না—

সামগ্র্যনুষ্ঠানগুণৈ সমগ্রাঃ
শূদ্রা যতঃ সন্তি সমা দ্বিজানাম্।
তস্মাদ্বিশেষো দ্বিজশূদ্রনাম্নো
নাধ্যাত্মিকো বাহ্যনিমিত্তকো বা॥—ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব, ৪১, ২৯

১৫৪ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দোহাকোষ, পৃ, ১৫, দোহা ১
১৫৫ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দোহাকোষ, পৃ, ৫৩
১৫৬ ঐ পৃ. ৮৪, ৮৫

ভবিষ্যপুরাণ বলেন, যেদিক দিয়েই দেখি না কেন দ্বিজে-শূদ্রে কোনো ভেদই তো দেখা যায় না। না বাহিরে না ভিতরে, না সুখে না ঐশ্বর্যে, না আজ্ঞায় না ভয়ে, না বীর্যে না আকৃতিতে, না জ্ঞানদৃষ্টিতে না ব্যাপারে, না আয়ুতে না অঙ্গপুষ্টিতে, না দৌর্বল্যে না স্থৈর্যে, না চপলতায় না প্রজ্ঞায়, না বৈরাগ্যে না ধর্মে, না পরাক্রমে না ত্রিবর্গে, না নৈপুণ্যে না রূপে, না ভেষজে না স্ত্রীগর্ভে, না গমনে না দেহমলসংপ্লবে, না অস্থিরন্ধ্রে না প্রেমে, না প্রমাণে না লোমে, কোথাও ব্রাহ্মণে শূদ্রে একটুও ভেদ দেখা যায় কি।

তস্মান্ ন বিভেদোঽস্তি ন বহির্নান্তরাত্মনি।
ন সুখাদৌ ন চৈশ্বর্যে নাজ্ঞায়াং নাভয়েষপি।
ন বীর্যে নাকৃতৌ নাক্ষে ন ব্যাপারে ন চায়ুষি।
নাংগে পুষ্টে ন দৌর্বল্যে ন স্থৈর্যে নাপি চাপলে।
ন প্রজ্ঞায়াঃ ন বৈরাগ্যে ন ধর্মে ন পরাক্রমে।
ন ত্রিবর্গে ন নৈপুণ্যে ন রূপাদৌ ন ভেষজে॥
ন স্ত্রীগর্ভে ন গমনে ন দেহমলসংপ্লবে।
নাস্থিরন্ধ্রে ন চ প্রেম্ণি ন প্রমাণে ন লোমসু।

—ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব, ৪১, ৩৫-৩৮

সব দেবতা যদি সমবেত হয়েও ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রত্যেক ধর্ম অতি যত্নেও তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেন তবু শূদ্র-ব্রাহ্মণের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ পাওয়া যাবে না।

শূদ্র ব্রাহ্মণয়োর্ভেদো মৃগ্যমাণোঽপি যত্নতঃ।
নেক্ষ্যতে সর্বধর্মেষু সংহতৈস্ত্রিদশৈরপি।—ঐ, ৪১, ৩৯

ব্রাহ্মণও কিছু চন্দ্রমরীচির মতো শুক্ল নন, ক্ষত্রিয়রাও কিছু কিংশুকপুষ্পবর্ণ নন, বৈশ্যরাও কিছু এই সংসারে হরিতালবর্ণ নন, শূদ্ররাও তেমনি অঙ্গারসমবর্ণ নন।

ন ব্রাহ্মণাশ্চন্দ্রমরীচিশুভ্রা
ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুকপুষ্পবর্ণাঃ।
ন চেহ বৈশ্যা হরিতালতুল্যাঃ
শূদ্রা ন চাঙ্গারসমানবর্ণাঃ।—ঐ, ৪১, ৪১

তবে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে প্রভেদ কিসে। চলাফেরায় তনু-বর্ণ-কেশে সুখে-দুঃখে

রক্তে ত্বকে মাংসে মেদে অস্থিমজ্জায় সবাই সমান। চারি বর্ণে তা হলে প্রভেদ কোথায়।

পাদপ্রচারৈস্তনুবর্ণকেশৈঃ
সুখেন দুঃখেন চ শোণিতেন।
ত্বঙ্‌ মাংসমেদোঽস্থিরসৈঃ সমানা
শ্চতুঃ প্রভেদা হি কথং ভবন্তি।—ঐ ৪১, ৪২

বর্ণে প্রমাণে আকৃতিতে গর্ভবাসে বাক্যে বুদ্ধিতে কর্মে ইন্দ্রিয়ে প্রাণে বলে ত্রিবর্গে রোগে ভেষজে কোথাও জাতিগত কোনো বিশেষ নেই :

বর্ণপ্রমাণাকৃতিগর্ভবাস-
বাগ্‌বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়জীবিতেষু।
বলত্রিবর্গাময়ভেষজেষু
ন বিদ্যতে জাতিকৃতো বিশেষঃ।—ঐ, ৪১, ৪৩

এই-সব কথার পর, সব কথার সার কথা বলেন ভবিষ্যপুরাণ, "চার বর্ণই যখন এক পরমপিতারই পুত্রকন্যা, তখন তাদের সবারই এক জাতি। সব মানুষের পিতা যখন এক তখন এক পিতার সন্তানদের মধ্যে জাতিভেদ হতেই পারে না।

চত্বার একস্য পিতুঃ সুতাশ্চ
তেষাং সুতানাং খলু জাতিরেকা।
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এব
পিত্রৈকভাবান্ ন চ জাতিভেদঃ।—ব্রাহ্মপর্ব, ৪১, ৪৫

এর চেয়েও প্রচণ্ড যুক্তিতর্কে জাতিভেদখণ্ডন করেছেন 'বজ্রসূচিকোপনিষৎ'। বজ্রসূচি বলেন, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চার বর্ণ, তার মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান এই বেদবচনানুরূপ স্মৃতিসকলেও বলা হয়েছে।"

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্।

"এখন বিচার করে দেখতে হবে ব্রাহ্মণ বলতে বুঝায় কাকে। জীব-দেহ-জাতি-জ্ঞান-কর্ম-ধার্মিক, এর মধ্যে কোন্‌টা ব্রাহ্মণ।"

তত্র চোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং জ্ঞানং কিং কর্ম কিং ধার্মিক ইতি। তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন ন।

"তার মধ্যে প্রথম হল জীব। জীবকে কি ব্রাহ্মণ বলা যায়। তা তো বলা চলে না। কারণ অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে নানাজাতীয় দেহের মধ্য দিয়ে জীব চলছে, সে তো একরূপ। এক জীবেরই কর্মবশে অনেক দেহ উৎপন্ন হয়। সর্বশরীরের জীবের একরূপত্বের কথা মনে করলেই বুঝা যায় যে জীব কখনও ব্রাহ্মণ হতে পারে না।

অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্মবশাদনেকদেহসংভবাৎ সর্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ। তস্মান্ ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি।

"তবে কি দেহই ব্রাহ্মণ। তাও তো নয়। আচণ্ডাল সকল মানুষেরই শরীর পাঞ্চভৌতিক আর এক রকমের। সর্বত্রই জরামরণধর্মাধর্মাদি একই রূপ। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, এমনও কোনো নিয়ম দেখা যায় না। দেহটাই যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে মৃত পিতা প্রভৃতিদের দেহ দগ্ধ করলে পুত্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ হত। কিন্তু তা তো হয় না। কাজেই দেহও ব্রাহ্মণ নয়।"

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। আচাণ্ডালাদিপর্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণধর্মাধর্মাদিসাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদিশরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষসম্ভবাচ্চ। তস্মান্ ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি।

"তবে কি জাতিই ব্রাহ্মণ। তবে জাত্যন্তরবিশিষ্ট অনেক জন্তুতে অনেক জাতি হত, আর সেইরূপ নানা জন্তুতেও দেখা যায় নানা জাতিবিশিষ্ট অনেক মহর্ষির জন্ম হয়েছে। মৃগী হতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হতে কৌশিক, জম্বুক হতে জাম্বুক, বল্মীক হতে বাল্মীকি, কৈবর্তকন্যা হতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হতে গৌতম, উর্বশী হতে বসিষ্ঠ, কলস হতে অগস্ত্যের জন্ম এইরূপ শ্রুতি আছে। জাতির বাইরেও জ্ঞানপ্রতিপাদিতা বহু ঋষি হয়েছেন। তাই জাতিও ব্রাহ্মণ নয়।"

তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্তকন্যায়াম্, শশপৃষ্ঠাদ্ গৌতমঃ, বসিষ্ঠ উর্বশ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তিঃ তস্মান্ ন জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি।

"তবে কি জ্ঞানই ব্রাহ্মণ। অভিজ্ঞ ও পরমার্থদর্শী ক্ষত্রিয়ও তো অনেক আছেন। তাই জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নয়।"

তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন, ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিন অভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি।

"তবে কি কর্মই ব্রাহ্মণ। সকল প্রাণীরই প্রারব্ধসঞ্চিত ও আগামী কর্মের সাম্য দেখা যায়, কর্মপ্রেরিত হয়েই লোক কর্ম করে তাই কর্মও ব্রাহ্মণ হতে পারে না।"

তর্হি কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। সর্বেষাং প্রাণীনাং প্রারব্ধসংচিতাগামিকর্মসাধর্ম্যদর্শনাৎ কর্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তো জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্বন্তীতি। তস্মাৎ ন কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি।

"তবে কি ধার্মিকই ব্রাহ্মণ। তাও তো নয়। কারণ হিরণ্যদাতা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বহু আছেন। তাই ধার্মিকও ব্রাহ্মণ নয়।"

তর্হি ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ ন ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি।

"তবে কাকেই বা বলা যায় ব্রাহ্মণ। তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি অদ্বিতীয় জাতি-গুণক্রিয়াহীন সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপ পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ এই কথাই শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ-ইতিহাসেরও অভিপ্রায়। অন্যথা আর কোনো প্রকারেই ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধি হতে পারে না।"

তর্হি কো ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিদাত্মানম্ অদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং…সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপং…সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য…বর্ততে…স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।

এই বজ্রসূচিকোপনিষৎ গ্রন্থখানিকে ৯৭৩-৯৮১ খ্রীস্টাব্দে চীনীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

ব্রহ্মপুরাণও বলেন, "জন্ম সংস্কার শ্রুতি সন্ততি কিছুর দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণ হয় চরিত্রে।"

ন যোনি নাপি সংস্কারো ন শ্রুতিন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্।—২২৩, ৫৬-৫৭

মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম বলছেন, "ব্রাহ্মণত্বের সম্পদ হল একতা, সমতা সত্যতা শীল অহিংসা সরলতা তপস্যা ও কর্মফলে অনাসক্তি। এমন সম্পদ ব্রাহ্মণের আর কিছুই নেই।"

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং
যথৈকতা সমতা সত্যতা চ
শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং
ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ ॥—শান্তিপর্ব, ১৭৫, ৩৭

যজুর্বেদের কাঠকসংহিতা তো ঘোষণাই করলেন, "জ্ঞানের দ্বারাই যিনি ব্রাহ্মণ তাঁর আবার পিতৃমাতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা কি। তাঁর মধ্যে জানবার মতো শ্রুত যদি থাকে তবে সে-ই তার পিতা, সে-ই তার পিতামহ।"

কিং ব্রাহ্মণস্য পিতরং কিমু পৃচ্ছসি মাতরম্।
শ্রুতং চেদস্মিন্ বেদ্যং স পিতা স পিতামহঃ ॥—কাঠকসংহিতা, ৩০, ১

এই-সব কথা যাঁরা বলেছেন তাঁরা সবাই ব্রাহ্মণ। কাজেই এ কথা বলা চলে না যে, ব্রাহ্মণেরাই জাতিভেদ চেয়েছেন, আর সেকালে অব্রাহ্মণেরাই জাতিভেদের উপর আক্রমণ করেছেন। এই প্রথাকে বেদে পুরাণে উপনিষদে ক্রমাগত যাঁরা আক্রমণ করে আসছেন তাঁরা সবাই ব্রাহ্মণ। বরং প্রাচীনকালে দেখা যায় অনেক অব্রাহ্মণও নিজগুণে ব্রাহ্মণ হয়েছেন। তার পরবর্তী যুগে ক্রমে ভারতে জাতিভেদ প্রবল হলে আর তেমনটি ঘটে নি। ভারতের বাইরে আর কোথাও আর্যদের মধ্যে জাতিভেদ নেই। প্রাচীন বেদ পুরাণাদিতে জাতিভেদের প্রতি আক্রমণ অনেক আছে। ক্রমেই তা কমে এসেছে। আর্য-প্রধান পঞ্চনদ প্রদেশের চেয়ে অনার্যপ্রধান দক্ষিণ-ভারত প্রভৃতি স্থানে জাতিভেদের প্রকোপ বেশি; এই-সব কারণে অনেকে মনে করেন জাতিভেদও একটি অনার্য সমাজব্যবস্থা, ভারতে আসাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমে তা আর্যরা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। পাশাপাশি পূর্বতন উচ্চনীচ নানা সংস্কৃতিগুলি বজায় থাকাতে এইরূপ একটা ভেদবিচার হয়তো আপনিই এসেছে। তবে আর্যোচিত সাম্য বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে যাঁরা ব্রাহ্মণোত্তম, তাঁরা বারবারই এই প্রথাকে আক্রমণ করেছেন। আর এখনও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যে যে তফাত তার চেয়ে ঢের বেশি তীব্র প্রভেদ হাড়ি ও মুচি প্রভৃতি শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে। দক্ষিণ-ভারতে তথাকথিত অন্ত্যজদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রচণ্ড ভেদ তা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাদিরা অনুমানও করতে পারেন না।

বেদপুরাণে ব্রাহ্মণ ও ঋষিমুনিরা জাতিভেদের তীব্রতার বিরুদ্ধে যেরূপ সব

মহাবাণী উচ্চারণ করে গেছেন, এই যুগেও ব্রাহ্মণ তুলসী হাথরসী রামমোহন দয়ানন্দ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের দল তা চালিয়ে গেছেন। তবে কেন এই অনার্য পদ্ধতিকে এখন অনেক ব্রাহ্মণ এত সমর্থন করেন এ কথা উঠতে পারে বটে। তার কারণ এই একটি আর্যেতর প্রথা আমাদের সমাজে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তা ছাড়া অনার্য প্রথাকে সমর্থন করার মতো যথেষ্ট অনার্য রক্ত পরবর্তীকালের আর্যদের দেহে যে প্রবাহিত হচ্ছে, তারও বহু প্রমাণ বেদে পুরাণাদিতে ভূরি ভূরি আছে। তার সাক্ষ্য যে বেদপুরাণে প্রচুর পাওয়া যায় সে কথা আমার 'ভারতে জাতিভেদ' নামক হিন্দী পুস্তকে দেখিয়েছি[১৫৭]।

যুগে যুগে নানা সংস্কৃতির সমাগমে ও সমন্বয়ে ভারতের সংস্কৃতিতে ও ধর্মে একটি উদার বিচার-বুদ্ধি ও নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা বার বার জেগে উঠেছে। যখনই কোনো কারণে জাতটা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন এই-সব উদার ভাব চাপা পড়েছে। আবার কোনো প্রচণ্ড আঘাতে বা কোনো কারণে জাতটা জাগলেই এই-সব ভাব আবার আপনাকে ঘোষিত করেছে। যাঁদের মুখে এই-সব ভাব আত্ম-প্রকাশলাভ করেছে তাঁরাই সেই-সেই যুগের গুরু মহাপুরুষ।

মধ্যযুগে গুরু রামানন্দের সাধনা ও কবীরের তপস্যার পর এই-সব কথা আর একবার জেগে ও কিছুদিন প্রবল থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার পর আবার জাগরণ ঘটল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে সমাগমের পর। তখন ভারতের এই-সব চিরন্তন সত্যই রামমোহন দয়ানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা আবার ব্যক্ত ধ্বনিত করলেন। তাঁরা নতুন কাণ্ড কিছুই করলেন না। যুগে যুগে যা চিরদিন ভারতে ঘটে এসেছে এই যুগে তাঁরা তাই পুনরায় বিঘোষিত করলেন।

সন্তদের মত

মধ্যযুগের সাধকদের সব কথা বলার স্থান এখানে নেই। তবু দু-একটা কথা না বললে চলবে না। জাতিভেদ তো সমাজতন্ত্রের কথা। তাঁদের ছিল ধর্মই আসল। মধ্যযুগে এই-সব সাধক-সন্তেরা ভগবানের সঙ্গে প্রেমের ব্যক্তিগত

১৫৭ ভারতবর্ষমেঁ জাতিভেদ, অভিনব ভারতী গ্রন্থমালা ১

যোগই খুঁজেছেন। এই যোগের পথে বাহ্য আচার, শাস্ত্র, ভেখ প্রভৃতির প্রয়োজন তাঁরা মানেন নি। তাঁদের পক্ষে ভগবৎপ্রেমের কাছে আর-সবই তুচ্ছ। স্বর্গের লোভ বা নরকের ভয়ে তাঁরা ধর্মের প্রবর্তনা স্বীকার করেন নি। প্রেমের ধর্মে ভগবানের সঙ্গে এমন একটি অভেদ ও সাম্য তাঁরা পেয়েছেন যা বেদান্তপ্রতিপাদ্য অভেদের চেয়ে অনেক সরস।

প্রেমের পথের পথিক বলে তাঁরা কায়াকে বৃথা ক্লিষ্ট করতে চান নি। অথচ প্রেমের জন্যই দেহ-মনের সর্বপ্রকার কলুষ সযত্নে তাঁদের পরিহার করতে হয়েছে। দেহকে তাঁরা দেবালয় মনে করেছেন। এই দেবালয়েই দেহাতীত চিন্ময় ব্রহ্ম বিরাজিত। মাটি-পাথরের দেবালয়ে যে-সব মূর্তি তার কোনো মূল্য নেই। বাহ্য উপচারের পূজা অর্থহীন। দয়া অহিংসা মৈত্রী এই-সবই হল আসল সাধনা। শাস্ত্রে এই-সব সাধনার তত্ত্ব মেলে না। দেহের মধ্যেই বিশ্ব। সেই পরম তত্ত্বটি দেখাতে পারেন গুরু, কাজেই গুরুর প্রতি তাঁদের অচলা ভক্তি। সাধুদের সৎসঙ্গে প্রেম উপজে, তাই সাধুসেবা এবং সাধুসঙ্গও মহাধর্ম। যেখানে ভক্ত সেখানেই ভগবান। বাহ্য আচারে হবে কী, প্রেমেই উপজে প্রেম[১৫৮]। ভগবানের স্বরূপই প্রেম। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় ক্রমে জন্মে রুচি আগ্রহ ও ভাব। ভাবে উপজে প্রেম। প্রেম হলেই প্রেম-স্বরূপের সঙ্গে যোগ হয় সহজ। এই সহজ যখন সিদ্ধ হয় তখনই জীবনের চরম সার্থকতা।

এই-সব তত্ত্বই তাঁরা শুনতেন গুরুদের মুখে। তাই গুরুদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তির আর অন্ত নেই। গুরুর প্রতি এই ভক্তি, বৌদ্ধ মহাযানধর্মে তন্ত্রে পুরাণে মধ্যযুগে সর্বত্রই দেখা যায়। 'পাহুড দোহা'তেও গুরুর মহিমা সর্বত্র বিঘোষিত। এই গুরুভক্তিটিও খুব সম্ভব আর্যেতর স্থান হতেই আর্যরা পেয়েছেন। বেদের আদিযুগে গুরুভক্তির এত প্রাচুর্ভাব কোথায়। ক্রমে সেটা বেড়ে চলেছে। ব্রহ্মচারীদের পক্ষে আচার্য বন্দনীয় ও অনুসরণীয়, তার মধ্যেও কতকটা সেই প্রভাব আছে। কিন্তু পরবর্তী গুরুবাদে গুরুর স্থান আরও বড়ো।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, ও ভারতীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ

---

১৫৮ "প্রেম প্রেমসোঁ হোয়", রবিদাস

এই যে গ্রীক প্রভৃতিদের মধ্যে গুরুরা বিদ্যা বেচতেন। বিদ্যা ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পয়সা দিয়ে কিনতে হত বলে গুরুরা তা ইচ্ছামত বেচতেও পারতেন। ভারতে ব্রহ্মচারীরা ও গুরুরা সকল সমাজের পালনীয়, এবং যেহেতু গুরুদের সাধনা বিশ্বসত্যকে নিয়ে, তাই তাঁদের অর্জিত জ্ঞানও বিশ্বের সবাকার। তাই গুরুদের জ্ঞান বেচবার অধিকার নেই। ভারতে তক্ষশীলা পুরুষপুর প্রভৃতি স্থানে গ্রীক প্রভাবে গুরুরা বিদ্যা বেচতেন বলে তাঁদের খুব নিন্দা ছিল। ভারতের সাধনাতে বিদ্যা কোথাও ব্যক্তিগত কিছু বস্তু নয়, তা সকল মানবের। 'বৃহৎ সংহিতা'র ভূমিকাতে বড়োই বিস্ময়ে এই কথা কার্ন সাহেব[১৫৯] লিখেছেন। উপনিষদের যুগ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভারতের সাধনাতে গুরুদের একটি মস্ত স্থান। গুরুরা বিদ্যা বেচেন না, বরং তাঁরা শিষ্যদের পালন করেন এবং সাধনা দিয়ে শিষ্যদের ধন্য করে বিশ্বসাধনাকে অগ্রসর করে চলেন।

কবীর প্রভৃতি সাধকেরা নিরক্ষর হতে পারেন, কিন্তু গুরুর কৃপায় তাঁরা সব তত্ত্বই জানতেন। আর তাঁদের নিজেদের ছিল অতুলনীয় প্রতিভা; তাই পণ্ডিত না হয়েও তাঁদের কোনো ক্ষতি হয় নি। বরং এমন-সব অপূর্ব তত্ত্বকথা কবীর প্রভৃতি সাধকেরা বলতেই পারতেন না যদি তাঁরা সব পণ্ডিত হতেন। কবীর ছিলেন জোলা, যাঁদের না আছে হিন্দু না আছে মুসলমান কোনো সংস্কারের ভার। সব প্রাচীন সংস্কারের ভার হতে তিনি মুক্ত। সর্ববিধ ভার হতে তিনি মুক্ত বলেই ভগবানের বাণী তাঁর কানে এত সহজে এসে পৌঁচেছে। বাংলাদেশের বাউলরাও এই জন্য এমন মুক্ত। তাঁদের গানে আছে :

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই
চলতে না পাই,
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে ॥

গুরু ও মোরশেদের দলের স্বার্থ আছে ভেদ-বুদ্ধি বাঁচিয়ে রাখায়। এ-সব কথা তাঁদের মুখেই আসে না। তাই ক্রমাগতই কথায় কথায় তাঁরা ভেদ-বিভেদেরই দোহাই পাড়েন।

১৫৯ Dr. H. Kern, Preface, p. 52

কবীরকে সবাই বললেন, "তুই নীচকুলের হয়েও কী করে এই-সব সত্য পেলি।" কবীর বললেন, "বৃষ্টি হলে, সে জল উঁচু জায়গায় তো দাঁড়ায় না, সব জল গিয়ে জমে নীচে, সবার পায়ের তলায়।"

উঁচে পানী না টিকৈ নীচৈ হী ঠহরায়।

—কবীর সাহেবকা সাথীগ্রন্থ, বালকদাসজী প্রকাশিত, পৃ. ৩৯৮

কবীর বললেন, "পণ্ডিতেরা পড়ে-পড়ে সব হলেন পাথর, লিখে-লিখে সব হলেন ইঁট, প্রেমের একটি ছিটাও পারে না তাদের মনে প্রবেশ করতে।"

পঢ়ি পঢ়িকে পত্থর ভয়ে লিখি লিখি ভয়ে জ ইঁট।
কবীর অংতর প্রেমকী লাগি নেক ন ছীঁট ॥—ঐ, ১৯৯

সংস্কৃতজ্ঞানহীন কবীর কাশীতে বসে চার দিকে পণ্ডিতদের মধ্যে নির্ভয়ে মনের কথা চলতি ভাষায় সজোরে প্রচার করতে লাগলেন—সকলে বললেন, "কবীর, এ কী কাণ্ড।" কবীর বললেন, "সংস্কৃত হল কূপজল, ভাষা হল বহতা জলধারা।"

সংস্কৃত হৈ কূপজল ভাষা বহতা নীর।—ঐ, ৩৭৯

নানা সংস্কৃতির মিলনে হিন্দু সংস্কৃতি গড়ে ওঠায় তার মধ্যে গতিশীলতার প্রতি একটি শ্রদ্ধা ছিল। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' দেখি ইন্দ্রের সার কথা 'এগিয়ে চলো'। মধ্যযুগেও সার কথা, 'এগিয়ে চলো'। অগ্রসর-না-হবার-মতো শিক্ষা আমরা আজকাল ইংরাজি শিক্ষিতদের মধ্যেই বেশি দেখি—ইংরাজি সভ্যতা আসলে স্থিতিশীল বা 'কনসার্ভেটিভ'। কবীর ছিলেন চিরদিনই সচল জীবন্ত ভাবের উপাসক। অচলতার অন্ধকারকে তিনি কোনোদিন পূজা করেন নি। তিনি বলতেন—বহতা জল থাকে নির্মল, বদ্ধ জলই হয়ে ওঠে দূষিত দুর্গন্ধ। সাধকরাও সচল হলেই ভালো। তাতে কোনো দোষই তাঁদের পারে না ছুঁতে।

বহতা পানী নিরমলা বংধা গংদা হোয়।
সাধ তো চালতা ভলা দাগ ন লাগৈ কোয় ॥—ঐ, ৭৬

পথ চলতে গিয়ে যদি কেউ পড়েও যায় তবু তাতে দোষ নেই।

মারগ চলতে জো গিরৈ তাকো নাহীঁ দোস ॥

—কবীর সাহেবকা সাথী গ্রন্থ, বালকদাসজী প্রকাশিত পৃ. ৩৬৪

অচলতার প্রতি কবীরের ভক্তি ছিল না। তাঁর প্রেম বলিষ্ঠ প্রেম তাই প্রেমের সাধনায় বীরত্বের সাধনা তিনি চেয়েছেন। এই সংসারে প্রবেশ করেই শোনা গেল আকাশে বাজছে রণ-দামামা, যুদ্ধের নাগাড়া বাজছে— তার তালে তালে মৃত্যুপণ করে হবে এগিয়ে চলতে।

গগন দামামা বাজিয়া পড়্যা নিসানৈ ঘাব।
—নাগরীপ্রচারিণী সভার কবীর গ্রন্থাবলী পৃ. ১৬৮

কবীর বলেন, যে মরণে সবারই ভয়, সেই মরণেই আমার আনন্দ। মরণপণ করেই নির্ভয়ে অগ্রসর হতে হবে।

জিস মরনৈঁ থৈঁ জগ ডরৈ সো মেরে আনংদ।—ঐ, পৃ. ৬৯

কবীর বলেন, প্রেমের ঘরে পৌছতে হলে অগম্য অগাধ পথে হয় চলতে। যে আপন মাথা পারে তাঁর চরণতলে ডালি দিতে সে জনই পায় প্রেমের স্বাদ।

কবীর নিজ ঘর প্রেমকা মারগ অগম অগাধ।
সীস উতারি পগ তলি ধরৈ তব নিকটি প্রেমকা স্বাদ।—ঐ, পৃ. ৬৯

সাধনার পথ দুর্গম ও অগাধ, তবু সাধকের দল এই পথে চলতে কখনো ভীত হন নি। ভারতের আকাশে বিধাতার যে আদেশবাণী তাঁর দামামায় নিত্য ধ্বনিত হয়েছে, সে হল সকল সাধনার সমন্বয়বাণী। এই পথে যে সাধক আসবেন তাঁর দুঃখ-দুর্গতি-লাঞ্ছনার আর অন্ত নেই। ঘরে বাইরে তাঁর জন্য উৎপীড়ন ও অত্যাচার দিবারাত্রি প্রতীক্ষা করছে। তবু যুগে যুগে ভারতের তপস্বীর দল এই-সব বিপদে ভীত হয়ে পিছপা হন নি। বীর চলেছে সংগ্রামে, সে কেন হবে পশ্চাৎপদ।

সূরা চড়ি সংগ্রামে কৌ পাছা পগ ক্যোঁ দেই।—দাদূ, সূরাতন অঙ্গ, ১৩

এ হল বীরদের সাধনার পথ, এখানে কাপুরুষদের স্থান নেই:

কাইর কাম ন আরই যহ সূরে কা খেত।—ঐ, ১৫

অষ্টপ্রহর এই সাধনার যুদ্ধ, বিনা খড়্গের এই সংগ্রাম।

আঠ পহর কা জূঝনা বিন খাংডৈ সংগ্রাম।
—কবীর সাহেবকা সাখীগ্রন্থ, সূরমা অংগ, ৫৯

ধরণী আকাশে চলেছে থরহরি, সকল শূন্য ভরে চলেছে গর্জন।

ধরণি অকাসা থরহরৈ গরজৈ সূঁনকে বীচ।

—কবীর সাহেবকা সাখীগ্রন্থ, সূরমা অংগ ১২৩

তারই মধ্যে যুগে যুগে ভারতীয় সাধকের দল তাঁদের মৈত্রী ও সমন্বয়ের বিরাট সাধনা নিয়ে নির্ভয়ে বীরের মতো অগ্রসর হয়েছেন। বাইরের বাধা ঘরের বিরোধ মাঝে মাঝে তাঁদের পথরোধ করলেও কিছুতেই তাঁদের সাধনার এই অগ্রগতিকে চিরকালের মতো রুদ্ধ করতে পারে নি। বিধাতার সেই মহা আদেশবাণী এখনও যাঁদের কানে পৌছবে, কোনো বিধিনিষেধ কোনো দুঃখ-বিপদ-বাধাই তাঁদের অপ্রতিহত গতিকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারবে না।

—

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বিশ্বপরিচয়	১·৮০
ইতিহাস	২·৫০
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
প্রাণতত্ত্ব	২·৩০
শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী	
বাংলা সাহিত্যের কথা	১·৫০
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	
ব্যাধির পরাজয়	১·৫০
পদার্থবিদ্যার নবযুগ	৩·০০
শ্রীনির্মলকুমার বসু	
হিন্দুসমাজের গড়ন	২·৫০
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	
ভারতদর্শনসার	৩·৩০
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
বাংলা উপন্যাস	২·০০
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা	২·৩০
সুরেন ঠাকুর	
বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ	২·৩০
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	
হিউএনচাঙ	২·৫০, বোর্ড ৩·০০
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	
পূজাপার্বণ	যন্ত্রস্থ
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	
বাংলার নব্যসংস্কৃতি	১·৪০
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য	
আহার ও আহার্য	১·৫০